
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
JIHAD
প্রকাশনায়
আল-জিহাদ পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]

জিহাদ ফি সাবিলিল্লা

প্রকাশক

আল-জিহাদ পাবলিকেশন্স

ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইন পরিবেশক

www.facebook.com/sharialaw610.com

Source: www.dawahilallah.com

সূচীপত্র

আলহামদুলিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার জমিনে দ্বীন হিসেবে ইসলামকেই মনোনীত করেছেন। আমাদেরকে তার দ্বীন ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করেছেন। আর আল্লাহর জমিনে জিহাদ চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষন না দ্বীন শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। দরুদ এবং সালাম বর্ষিত হোক স্যায়িদুল মুরসালিন মুহাম্মদ সাঃ, তার পরিবার এবং সকল সাহাবা কেরামদের প্রতি।

জিহাদ ফি সাবিলিল্লার ব্যাখ্যা

জিহাদ ফি সাবিলিল্লার ব্যাখ্যা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ হাদিসের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলোঃ

অর্থাৎ, বলা হলোঃ জিহাদ কি? তিনি বললেন, কাফিরদের সাথে লড়াই করা যখন তাদের সাথে সাক্ষাত হয়। বলা হলোঃ কোন জিহাদ সর্বোত্তম? তিনি বললেনঃ যার ঘোড়া নিহত হয় ও রক্ত প্রবাহিত হয়। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাইহাকী, সনদ সহীহ)

শরয়ী অর্থ ও শাব্দিক অর্থের পার্থক্য

শাব্দিক অর্থ ও শরয়ী অর্থের এ পার্থক্য ইসলামের প্রত্যেকটি পরিভাষার ক্ষেত্রে রয়েছে। সুতরাং এ পার্থক্যকে না জানা অথবা না জানার ভান করা কোনো মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এরূপ পার্থক্যের কিছু উদাহরণ:

সালাত এর শাব্দিক অর্থ হলো, আগুনে পুড়ে বাঁশ বা সরু গাছ সোজা বা বাঁকা করে (ধনুক তৈরি বা অন্য কাজের) ব্যবহার উপযোগী করা। এছাড়া ব্যবহারিকভাবেও সালাত শব্দটি চার অর্থে প্রয়োগ হয়। যথা: ১. দরুদ ২. তাসবীহ ৩. রহমত ৪. ইস্তিগফার।

কিন্তু আমরা সালাত বলতে বুঝি নির্ধারিত সময়ে, বিশেষ নিয়মে, নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত করাকে।

সাওম এর আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। কিন্তু সাওম বলতে আমরা বুঝি, নির্ধারিত সময়ে বিশেষ নিয়মে, নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত করাকে।

হজ্জ এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। কিন্তু হজ্জ বলতে আমরা বুঝি, নির্ধারিত সময়ে বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম বিশিষ্ট ইবাদত পালন করাকে।

যাকাত এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা, বৃদ্ধি করা। কিন্তু যাকাত বলতে আমরা বুঝি, বিশেষ শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা।

একইভাবে জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ কষ্ট করা, চেষ্টা করা হলেও জিহাদ বলতে আমরা বুঝবো ইসলামী খিলাফতের পক্ষ থেকে, খলীফার নির্দেশে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে।

আমরা জানি হযরত মুহাম্মদ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের মক্কী জীবনে দাওয়াত-তাবলীগ ছিল, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারসহ যিকির-ফিকির ও জালিমের সামনে হক কথা বলা ছিল, ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু এতসব কর্মকাণ্ডকে মক্কী জীবনে জিহাদ বলা হয়নি। সাহাবায়ে কিরামও দাবি করেননি এসব সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বা প্রাণান্তকর চেষ্টার নাম জিহাদ ছিল।

'জিহাদ' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'সর্বাত্বক চেষ্টা-সাধনা' হলেও ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে জিহাদ অর্থ হলোঃ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের আরবী ভাষ্যকার ইমাম কাসতালানী (রঃ) বলেন,

"জিহাদ হলোঃ দ্বীন ইসলামকে সাহায্য করার জন্য ও আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফিরদের সাথে কিতাল করা।"

ইমাম ইবনে হুমাম (রঃ) বলেন,

"জিহাদ হচ্ছে কাফিরদেরকে সত্য দ্বীন ইসলামের প্রতি আহবান করা এবং যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সাথে লড়াই করা।" (ফাতহুল ক্বাদীর ৫/১৮৭)

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) বলেনঃ

"শরীয়াতের পরিভাষায় জিহাদ হলোঃ আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে সর্বশক্তি ব্যয় করা" । (উমদাতুল ক্বারী, ১৪/১১৫)

ইমাম কাসানী (রঃ) বলেন,

"শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা" । (আল বাদায়ীউস সানায়ী ৯/৪২৯৯)

মালেকী মাজহাবে জিহাদের সংজ্ঞা হলোঃ

"মুসলিমের জন্য আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে যেসব কাফির কোন চুক্তির অধীনে নয় তাদের বিরুদ্ধে অথবা যদি তারা আক্রমণ করার জন্য মুসলিমের সামনে উপস্থিত হয় অথবা যদি মুসলিমের ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।" (হাশিয়া আল – আদাউয়ি, আস-সায়িদী ২/2 এবং আশ-শারহুস সগীর আকরাব আল-মাসালিক লিদ-দারদীর; ২/২৬৭)

শাফেয়ী মাজহাবের ইমাম বাজাওয়ারী (রঃ) এর মতেঃ

"আল জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে লড়াই করা" । (হাশিয়াত বাজাওয়ারী আলা শারহুন ইবনুল কাসিম, ২/২৬১)

ইবনে হাজার (রঃ) এর মতেঃ

"শরয়ী দৃষ্টিতে এর অর্থ হলো কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই এ ত্যাগ স্বীকারমূলক সংগ্রাম" । (ফাতহুল বারী ৬/৩)
হাম্বলী মাজহাবের সংজ্ঞা হচ্ছেঃ

"(জিহাদ হচ্ছে) কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করা" । (মাতালিবু উলিন নাহি ২/৪৭৯)

"আল জিহাদ হচ্ছে আল ক্বিতাল এবং এই লড়াইয়ে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আইনকে সমুন্নত রাখা" । (উমদাতুল ফিকহ ১৬৬ পৃষ্টা ও মুনতাহাল ইরাদাত ১/৩০২)

ইমাম বুখারী (রঃ) 'কিতাবুল জিহাদে' শুধু কিতাল সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোই উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও 'জিহাদ অধ্যায়ে' ঘোড়া, তরবারী, বর্ম, গণিমত, বন্দী, আক্রমণ ইত্যাদি কিতাল সংশ্লিষ্ট হাদিসগুলোই উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে ফুকাহায়ে কিরামও ফিকহের কিতাব সমূহে জিহাদের আলোচনায় কিতাল সম্পর্কিত মাসায়েল উল্লেখ করেছেন।

বর্তমান সময় ও জিহাদ

আল্লাহ রাব্বুল ইযযাহ কালামে পাকে বলেন:

আর তাদের (কাফিরদের) মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না। [Al-Anfal 8:60]

আল্লাহ আরো বলেন,

তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? (অথচ) তোমরা যাকে ভয় করবে তাদের চেয়ে বেশি হকদার হলেন আল্লাহ, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। তাদের বিরোদ্ধে লড়াই কর, তোমাদের হাত দিয়েই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন, তাদেরকে অপমানিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করবেন, আর মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন। -(আত তাওবা: ১৩-১৪)

বর্তমানে উম্মতে মুহাম্মাদী এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। এতটাই কঠিন যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না। শাম, ইরাক, ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, কাশ্মীর, আরাকান, চেচনিয়া, চীন - দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তে আজ মুসলিম উম্মাহ'র দুর্দশা যে কোন সময়ের থেকে অনেক অনেক বেশি করুন! উম্মতে মুহাম্মাদীর এই কঠিন অবস্থার কথা রাসুল সাঃ বলে গেছেন।

সাওবান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত - তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ খাদ্য গ্রহনকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চতুর্দিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতীয়রা (কাফিররা) তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যাক্তি বলল সেদিন কি আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারনে এরুপ হবে? তিনি বললেনঃ তোমরা বরং সেদিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে "আল ওয়াহহান" ঢেলে দিবেন। এক ব্যাক্তি বলল আল ওয়াহহান কি? তিনি বললেনঃ দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা। (সহীহ- আলবানী)

কিন্তু এর পরেও উম্মতের গাফেলাতি, অবহেলা, উদাসীনতা, দ্বীনের ব্যাপারে শিক্ষার অভাব, আল্লাহর দ্বীনের উপরে অন্য দ্বীনের মুহাব্বাত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা, ইত্যাদি কারনে উম্মতের জিল্লাতি তার চূড়ান্ত সীমায় পৌছে গেছে। কিন্তু এ কথার দ্বারা যেমন উম্মতের জিল্লাতি গ্রহনযোগ্য হয়ে যায় না একইভাবে কোন মুসলিমই এ দায়ভার থেকে নিজেকে জবাবদিহিতার বাইরে রাখতে পারে না, যতক্ষন না আল্লাহ অন্য কিছু চান।

নিশ্চয়ই এই উম্মত জিহাদ ছেড়ে দেয়ার জন্য লাঞ্ছিত হয়েছে যেমনটি রাসূল (সাঃ) এর হাদীসে এসেছে ইবনু উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণত। তিনি বলেন আমি রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছিঃ

যখন তোমরা বাইয়ে ঈনাহ বা সূদভিত্তিক ক্রয়-বিক্রয় শুরু করবে, গরুর লেজ ধারণ করে থাকবে, অর্থাৎ কৃষি কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ছেড়ে দেবে তখন আল্লাহ তা 'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন; আর এ লাঞ্ছনা দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের সঠিক দীনের দিকে ফিরে আসবে। (আবূ দাঊদ হা: ৩৪৬২, সহীহ)

মেকি ভ্রান্ত মায়াজালে পথভ্রষ্ট, মোহবিষ্ট মুসলিম উম্মাহ'র মধ্যে যে শব্দটি মারান্তক ভ্রান্তিমূলক হয়ে দাড়িয়েছে তা হচ্ছে জিহাদ। জিহাদ শব্দটি শুনলে কাফিরদের যেমন অন্তরাত্মা কেপে উঠে বড় আফসোসের বিষয় একই ভাবে মুসলিম ঘরের সন্তানেরাও আজ জিহাদ শুনলে ভয় পায়! বাবা-মার মুখ শুকিয়ে যায়, মনে হয় যেন সন্তানকে সাপে কামড় দিয়েছে কিংবা এর থেকেও ভয়ংকর কিছু। সন্তান যিনা করছে এই সংবাদ আমাদের বাবা-মা দের ভাবায় না, চিন্তিত করে না, লজ্জিত করে না, কিন্তু সন্তান জিহাদ করে এই কথা তাদের ভীত করে তুলে, শঙ্কিত করে তুলে, তারা এমন সন্তানের ব্যাপারে লজ্জিত হয়! এটা যেমন আফসোসের তেমন লজ্জার! এর অন্যতম কারণ ৩ টি।

১। দ্বীন বিমুখীতা
২। দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং
৩। দ্বীনি জ্ঞানের অভাব

ইসলামের আগমনের সাথে সাথেই জিহাদের সুচনা হয়েছে। ইসলাম, জিহাদ এগুলো কোন আলাদা বিষয় নয়। জিহাদ ব্যাতিত ইসলাম কায়েম হবে এমন ভাবা অবাস্তব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা অনেক জায়গায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'র কথা উল্লেখ করেছেন। আজ আমরা জিহাদকে ভয় পাই, লজ্জা পাই! অথচ এই জিহাদের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা এবং সন্মান নিহিত। এটা কাফিররা জানে যে এই উম্মত যদি জিহাদ না ছাড়ে তবে তাদের পরাজয় ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই, তাই তাদের অনেক বড় একটা প্রচেষ্টা এই যে, উম্মাহকে জিহাদ থেকে সরিয়ে রাখা, জিহাদ বিমুখ করা এবং জিহাদের ব্যাপারে ভ্রান্তি তৈরি করা। এই উম্মাহ যদি নিজের সন্মান এবং নিরাপত্তা অর্জন করতে চায় তবে তাদেরকে জিহাদের মাধ্যমেই অর্জন করতে হবে, মনে রাখা দরকার -"জিহাদ হচ্ছে এই উম্মাহর বর্ম"!

আপনি ভাল করে লক্ষ করে দেখুন, যখন উম্মতের মধ্যে জিহাদ চালু ছিল তখন সারা দুনিয়ায় কতজন মুসলিম মা বোনকে আর নিস্পাপ শিশুদেরকে হত্যা করা হয়েছে? আর তাকিয়ে দেখুন আজ যখন উম্মত জিহাদ ছেড়ে দিল তখন কি অবস্থা!

আমি আপনাদেরকে স্মরন করিয়ে দিতে চাই, আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তায়ালা এর কালাম। তিনি বলেন,

বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা -২৪)

আল্লাহ এই আয়াত নাজিল করেছেন সাহাবা (রাঃ)-দের উল্লেখ করে (যদিও এই আয়াত শুধু মাত্র সাহাবীদের জন্যই খাস না), যাদের জিন্দেগীই ছিল জিহাদের মধ্যে। তাদের জন্য যদি এই সতর্কবাণী হয়ে থাকে তবে জিহাদ ছেড়ে দেয়া এই উম্মতের জন্য এই আয়াত এখনো কালামে পাকে সাক্ষী হয়ে আছে! শুধুমাত্র এই বিষয়ের উপরে আলিমগণ অসংখ্য কিতাব লিখেছেন তাই এই ব্যাপারে গভীর আলোচনা এই লেখার মাকসাদ না। শুধু এতটুকুই আমাদের জেনে রাখা দরকার উম্মতের জন্য জিহাদ হচ্ছে সম্মান জিহাদকে ছেড়ে দিয়ে এই উম্মত কখনো নিরাপত্তা লাভ করতে পারেনা, পারবেনা। আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ না করলেই নয় সেটি হচ্ছে সারা দুনিয়া এখন দুটি মেরুতে বিভক্ত এক হিজাব আশ শাইতান এবং হিজাব আর রাহমান শয়তানের দল এবং আর রাহমানের দল এই দুইয়ের মাঝে কিছু থাকতে পারে না, কারণ কাফেররা তা থাকতে দিবে না এখন আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি কোন দলের সাথে?

সবশেষে যে বিষয়টি উল্লেখ করব আপনি এবং আমি যুদ্ধের ময়দানেই আছি। যে যত দ্রুত তা উপলব্ধি করতে পারবে সেটা ততই তার জন্য মঙ্গল জনক।

আল্লাহ বলেন, হে নবী, আপনি মুমিনদের কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। (আল-আনফালঃ ৬৫) আল্লাহ আরও বলেন, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাও যে পর্যন্ত না ফিতনা (কুফর ও শিরক) খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (আল-আনফালঃ ৩৯)

আর এই গাইড এর উদ্দেশ্যও তাই - মুমিনদের কিতালের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। প্রথম আয়াতে স্পষ্ট করে সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহ মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন তাদের সাথে (কাফের, মুশরিক এবং ফেৎনা কারী) যুদ্ধ চালিয়ে যাও যতক্ষণ না দুনিয়ার বুকে শুধু আল্লাহর দ্বীন বিজয় হয়।

মুফাসসিরগণ এই আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে - যতক্ষন শিরক এবং কুফর অবশিষ্ট থাকবে (কেননা তা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা) এবং ইসলাম দুনিয়ার বুকে বিজয়ী না হবে, ততক্ষন পর্যন্ত আল্লাহ জিহাদ চালিয়ে যেতে বলেছেন। আর এই অবস্থা কিয়ামত এর আগে হবেনা তাই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জিহাদ চালু থাকবে। আর এই একই ব্যাখ্যা আমরা একটি সহীহ হাদিস থেকে পাই উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা এ কথা স্বীকার করে সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই, আর মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং সালাত আদায় করবে ও যাকাত আদায় করবে- ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার। যখন তারা এরূপ কাজ করবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী কেউ যদি কোন দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, তবে সে দণ্ড তার উপর কার্যকর হবে। তারপর তার অদৃশ্য বিষয়ের (অন্তর সম্পর্কে) হিসাব ও বিচার আল্লাহর উপর ন্যস্ত। (বখারী ২৫, মুসলিম ২২, সহীহ ইবনু হিব্বান ১৭৫, মিশকাতুল মাসাবিহ ১২, বায়হাক্বী ৫১৪১)

তবে সহীহ মুসলিমে "কিন্তু ইসলামের বিধান অনুযায়ী" বাক্যটি উল্লেখ করেননি।

তাহলে অন্তত এই ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ করার কোন সুযোগ নেই যে কিয়ামতের আগ পর্যন্ত জিহাদের হুকুম আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন এবং শুধু তাই না বরং জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ব করার জন্য তার রাসূল (সাঃ) কে আদেশ দিয়েছেন। এটা তো সাফ হয়েই গেলো। তবে হ্যা এখনও আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর দল বিশ্রাম নিবে না। আর কাফিররাও না।

সুতরাং এটা দিবালোকের মত পরিস্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে - জিহাদের হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এটা ইসলামের একটি ফরজ বিধান, এই ব্যাপারে কারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখার অবকাশ নাই। আল্লাহ বলেন- কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম -তোমাদের উপরে রোজার বিধান দেয়া হল, আল্লাহ বলেন, - কুতিবা আলাইকুমুল কিতাল - তোমাদের উপরে কিতালের বিধান দেয়া হল।

আমাদের মূল লক্ষ্য জিহাদের কাজে শরীক হওয়া যেহেতু এখন আমাদের সবার উপরে জিহাদ ফরজে আইন, বাধ্যতামূলক আর জিহাদের এই কাজ জামাতবদ্ধ হয়ে করার জরুরি। শুধু জিহাদ না বরং ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে জামাতবদ্ধ থাকা। আল্লাহ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন এক হয়ে থাকতে এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত না হতে।

আজ আমরা ইবাদতের নামে ক্রীড়া কৌতুকই করছি। আমরা ঐ সময় হারামাইনের স্নিগ্ধ পরিবেশে নামাজে দাঁড়িয়ে আছি যখন মুসলমানদের ইজ্জত আব্রু নিয়ে হোলি খেলা হচ্ছে। নির্মমভাবে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। বৃদ্ধদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। মুসলিম দেশে দেশে ইহুদি খ্রিস্টান আর কাফেররা আক্রমণ করে তার পবিত্র স্থানগুলো অপবিত্র করছে। ধন-সম্পদ

ছিনিয়ে নিচ্ছে। হারামাইনে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় এ নামাজ কি দ্বীন নিয়ে কৌতুক নয়? দ্বীন নিয়ে খেলায় লিপ্ত হওয়া নয়?

মনে কর, তোমার স্ত্রীর কামরায় ডাকাত ঢুকে তার ইজ্জত আব্রু রক্তাক্ত করছে আর তুমি পার্শ্ববর্তী কামরায় নিশ্চিন্তে নামাজে দাঁড়িয়ে আছ। তোমার এ নামাজ তোমার জন্য অভিশাপ। এটি কিভাবে চিন্তা করা যায় যে, তোমার স্ত্রীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হবে আর তুমি পার্শ্ববর্তী কামরায় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকবে? কুরআন তিলাওয়াত করবে?

বর্তমানে জিহাদ ফরজে আইন

ফরজ কাজ কাকে বলে?
উত্তর: ফরজ বা ওয়াজিব হলো সেই কাজগুলো যা কোনো মুসলমানকে অবশ্যই করতে হবে। ফরজ কাজ করলে সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ হবে। যেমনঃ ফজরের ২ রাকা'আত ফরজ নামাজ। কিভাবে বুঝব কোনো কাজ ফরজ? আল্লাহ্ বা রাসূলুল্লাহ(সা) যে কাজগুলো আমাদেরকে পালন করতে বলেছেন এবং এর কোন ব্যতিক্রম (exception) করেন নাই, সেই কাজগুলি ফরজ বা ওয়াজিব। আল্লাহ্ সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতে বলেনঃ নবী যা কিছু তোমাদের পালন করতে আদেশ করেন তা করো, আর তিনি যা কিছু করতে নিষেধ করেছেন তা ছাড়ো।

ফরজ ও ওয়াজিব এর পার্থক্য: ফরজ বা ওয়াজিব এই দুইটি শব্দেরই অর্থ বাধ্যতামূলক। এই দুইয়ের মধ্যে শব্দগতভাবে কোনই পার্থক্য নাই। অধিকাংশ স্কলার এই দুইটি শব্দকে সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু, আমাদের দেশে প্রচলিত ভাবে কোনও কোনও কাজকে ফরজ (যেমন জুমু'আর ২ রাক'আত নামাজ), আর কোনও কোনও কাজকে ওয়াজিব (যেমন নামাজে সূরা ফাতিহা পড়া) বলা হয়ে থাকে হানাফী মাজহাবের প্রভাবের কারণে ।

ফরজ দুইভাগে বিভক্ত।
ফরজে আইন অর্থাৎ যা শরিয়াতের বিধান আরোপিত হয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর পালন করা অবশ্য কর্তব্য। উদাহরণঃ ৫ ওয়াক্তে ১৭ রাক'আত ফরজ নামাজ পড়া, রমজান মাসের সবগুলো রোজা রাখা, মেয়েদের পর্দার বিধান মেনে চলা ইত্যাদি।
ফরজে কিফায়া এমন বিধানকে বলে, যা সমষ্টিগতভাবে সকল মুসলমানের উপর ফরজ, তবে সমাজের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি তা পালন করলে বাকিরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কেউ না করলে সবাই ফরজ অনাদায়ে দায়ী হবে। উদাহরণঃ জনাজার নামাজ।
ফরজ নির্দেশগুলো পালন না করলে আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন, ইসলামের বাকী নির্দেশগুলো - যেমন মুস্তাহাব, মুবাহ্ ইত্যাদি পালন না করলে কোনো শাস্তি হবে না। তাই, আমাদের উচিত সর্বপ্রথম আল্লাহ্র ফরজ হুকুমগুলো জানা এবং এগুলো ঠিকমত পালন করা। কেউ ফরজ কে অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে, আর যে ছেড়ে দেয় সে ফাসিক বলে সাব্যস্ত হয়।
"যদি মুসলিমদের ভুমির এক বিঘত পরিমাণের জায়গাও কুফফাররা দখল করে নেয়, তখন প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর উপর জিহাদ করা ফরজে আ'ইন (সবার জন্য ফরজ) হয়ে যায়। ঐ মূহুর্তে জিহাদে বের হওয়ার জন্য সন্তানের প্রয়োজন হয় না তার পিতা-মাতার কাছ থেকে আনুমতি নেয়া এবং স্ত্রীরও তার স্বামীর কাছ থেকে আনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না।" -শহীদ ড: আব্দুল্লাহ আযযাম (রহীমাহুল্লাহ). মুসলিমান ভূমি দিফা (প্রতিরক্ষা) করার জিহাদ ঈমান আনয়নের পর সবচেয়ে জরুরী ফরয। শহীদ শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহিমাহুল্লাহ) এর এই ফতোয়াটি সর্বজন গ্রহনযোগ্য এবং খুবই জরুরী।

শত্রু যদি কোন মুসলিম জনপদে অনুপ্রবেশ করে তবে সকল ফুকাহায়ে কেরাম মুফাসসিরীন এবং মুহাদ্দেছীনদের মতানুযায়ী জিহাদ ফরজে আ'ইন হয়ে যায়। জিহাদ ফরজে আইন হয়ে গেলে তিন ইমামের নিকট সে অবস্থায় জিহাদ ও নামাজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আর হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের নিকট নামাজ হচ্ছে জিহাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ন । শরিয়তের কোন ওজর ব্যতীত ফরজে আইন জিহাদকে ত্যাগকারী এবং ওজর ব্যতীত রমজানের রোযা ভংগকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
ইমামুল মাগাজী আল্লামা ইবনে নুহহাস (রাহ:) বলেন,

যদি কোন কাফের দল মুসলিম শহর দখলের জন্য প্রবেশ করে, হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কোন কোন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। অথবা আক্রমণের নিয়তে মুসলিম শহরের নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করে, যে অবস্থানের সৈন্যসংখ্যা মুসলিম জনসংখ্যায় দ্বিগুণ বা বা তার চেয়ে কম তবে সমস্ত মুসলমানের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

আমাদের দেশে জিহাদ ফরজ হওয়ার কারন গুলো উল্লেখ করলে ভালো হবে। প্রথমেই আমি বলতে চাই জিহাদের ফরজ বিধান দুই প্রকার। ১) ফরজে কেফায়া ও ২) ফরজে আইন। স্বাভাবিক অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া। আর বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে আইন হয়। চারটি পরিস্থিতিতে জিহাদ ফরজে আইন হয়। তা নিম্নরূপ:

১. যদি কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে । এবং তাদের উপর আক্রমন করে ।
২. যদি দু'টি বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাড়ায় এবং একে অপরকে আহ্বান করতে শুরু করে ।
৩. যদি খলিফা কোনব্যক্তি অথবা জনগনকে জিহাদের আহ্বান জানায় তাহলে অবশ্যই বেরিয়ে পরতে হবে ।
৪. যদি কাফেররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে বন্দী করে ফেলে । তাদেরকে মুক্তকরা পর্যন্ত জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় ।

এবার দেখব এ বিষয় গুলো বর্তমানে উপস্থিত আছে কিনা? এর যে কোনটি একটি উপস্থিত থাকলেই জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এখানে বুঝার বিষয় যে, যদি কাফেররা মুসলিমদের কোন ভুমি দখল করে নেয় তবে প্রথমে উক্ত ভুখন্ডের মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়। যদি তারা শত্রুর মোকাবেলা করে তাদের ভুমি শত্রু মুক্ত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলিমদের উপর এ বিধান ফরজ হয়। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম ভুমি শত্রুমুক্ত না করা সম্ভব হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ বিধানের পরিধি বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে তা সারা বিশ্বের মুসলিমদের উপর বর্তায়। এবার দেখা যাক আমাদের ভুখন্ডে (বাংলাদেশ) জিহাদের বিধান কি? আমরা উপরের চারটি পয়েন্টের আলোকে দেখব ইনশাআল্লাহ।

১. ''যদি কাফেররা মুসলিমদের ভূমিতে প্রবেশ করে । এবং তাদের উপর আক্রমন করে'' এই পয়েন্টে আমরা খেয়াল করব, আমাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিম ভুখন্ড আরাকানের দিকে। সেখানে মুসলিম ভুখন্ডে কাফেররা ডুকে নির্বিচারে মুসলিম হত্যা করছে। তারা (মুসলিমরা) তাদের (কাফেরদের) হামলা প্রতিরোধের জন্য নিজেরা পেরে না উঠায় তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলিম ভুখন্ডগুলোর প্রতি সাহায্য চেয়েছে। সে মতে তাদের (আরাকানি) পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতিটি মুসলিমের উপর জিহাদ এখন ফরজে আইন হয়ে গেছে।
বিঃদ্রঃ বর্তমানে বিভিন্ন দেশ নাম দিয়ে যে তারকাটার বেড়া তৈরি করা হয়েছে তা ইসলামের বিধানকে প্রভাবিত করবে না এবং এই সীমানা ভাগ শরিয়া দ্বারা প্রমাণিত বলে কোন দলিল আমার জানা নেই।

২. ''যদি দু'টি বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি এসে দাড়ায় এবং একে অপরকে আহ্বান করতে শুরু করে'' এ ব্যাপারে আমি বলব আমাদের পার্শ্ববর্তী ও দুরবর্তী কয়েকটি মুসলিম ভুখন্ডে মুসলিম ও কুফফার বাহিনী মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে সিরিয়া সরাসরি প্রকাশ্যে কাফেদের সাথে মুখোমুখি যুদ্ধে লিপ্ত আছে। তা ছাড়া, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, সোমালিয়া, বার্মা, কেনিয়া, ইরাক সহ বেশ কিছু ভুখন্ডে মুসলিমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। এবং তারা সারা বিশ্বের

মুসলিমদের প্রতি জিহাদে অংশগ্রহণ এর আহবান জানিয়েছে। সুতরাং এ দিক থেকেও আমাদের উপর জিহাদ ফরজে আইন।

৩. ''যদি খলিফা কোন ব্যক্তি অথবা জনগনকে জিহাদের আহ্বান জানায় তাহলে অবশ্যই বেরিয়ে পরতে হবে'' এ ব্যাপারে আমি বলব, মুসলিমদের আমীর, আমিরুল মুজাহিদিন মোল্লা ওমর (রাহঃ) সারা বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি আহবান জানিয়ে ছিলেন আফগানিস্তান এ জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্য। যে জিহাদ এখনো চলছে। এবং বর্তমানে তাদের কার্যক্রম বাংলাদেশও চলছে। বর্তমান আমিরুল মুজাহিদিন শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরি হাফিঃ বিশ্বময় জিহাদের ডাক দিয়েছেন। সে মতে সকল মুসলিমের উপর এখন জিহাদ ফরজে আইন।

৪. ''যদি কাফেররা মুসলিমদের মধ্য থেকে কিছু মানুষকে বন্দী করে ফেলে । তাদেরকে মুক্তকরা পর্যন্ত জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়'' এ বিষয়ে মনে হয় বলার আর তেমন কিছুই নাই। কেননা বর্তমানে সারা বিশ্বে অসংখ্য মুসলিম কাফেরদের হাতে বন্ধী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশেও অসংখ্য মুসলিম বর্তমান মুরতাদ শাসক কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে জেলে আছে শুধু এই অপরাধে যে তারা একমাত্র আল্লাহর আইন চায়। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, বাংলাদেশের তাওহীদের কাণ্ডারি, জিহাদের পুনঃজাগরণের অগ্রদুত, লক্ষ লক্ষ তাওহীদি মুসলিমের প্রানপ্রিয় আলেম, শাইখুল হাদিস মুফতি মুহাম্মদ জসিমুদ্দিন রাহমানি হাফিজাহুল্লাহ (আল্লাহ তাকে কাফেরদের কারাগার থেকে মুক্ত করুন)। এখানে একটি বিষয় প্রতিয়মান যে আপনাদের অনেকের মনে হতে পারে বর্তমান সরকার মুরতাদ হয় কিভাবে যখন তারা নিজেদের মুসলিম দাবি করে। এ ব্যাপারে আমি মহান আল্লাহর একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিব ইনশাআল্লাহ।

সরকার মুরতাদ হয় কিভাবে?

মহান আল্লাহ বলেন, আল-মা'ইদাহ ৫:৪৪

আমি তওরাত অবর্তীর্ন করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না, যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।
আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, আল-আ 'রাফ ৭:৫৪

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্টিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমতাবস্থায় যে, দিন দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র দৌড় স্বীয় আদেশের অনুগামী। শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

ইউসুফ ১২:৪০

তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

উপরোক্ত দুটি আয়াত পড়লেই বুঝা যায় আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন প্রণয়ন করার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেন নি। আল্লাহর আইনের বিপরীতে আইন প্রণয়ন করা কুফুরি ও শিরক। কেউ আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে সে যায়গায় ভিন্ন আইন তৈরি করলে, সে আইনে বিচার ফায়সালা করলে এবং তা মানতে কাউকে নির্দেশ করলে সে প্রকাশ্য শিরক ও কুফুরি করল। এবং একাজ কোন মুসলিম করলে তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে এবং সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আর বর্তমান সরকার আল্লাহর অসংখ্য আইন বাদ দিয়ে ভিন্ন আইন তৈরি করছে এবং তদানুযায়ী বিচার ফায়সালা করছে। এর মধ্যে রয়েছে চুরের শাস্তি হাত কাটা পাল্টে জেল ও জরিমানা করা, জিনার শাস্তি বাদ দিয়ে উল্টো পতিলালয়ের লাইসেন্স দিয়ে জিনাকে বৈধ (হালাল) করে দিয়েছে এই সরকার। এরকম আইনের অভাব নাই।
এ ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন (আল কোরআন ও সহিহ সুন্নাহ) বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন (সংবিধান) কে দেশের সর্বোচ্য আইন নির্ধারন করে নিয়েছে এই মুরতাদ সরকার। যা তাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি বাংলাদেশ সংবিধানের ৭(২) ধারায় বলা হয়েছে- "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"
এখানে সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক সকল আইনকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন আল্লাহর আইন বাতিল করার ক্ষমতা কারো নাই।

অপরদিকে মহান আল্লাহ বলেন, আল ইমরান ৩:১৮৯
আর আল্লাহর জন্যই হল আসমান ও যমিনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, আল-মা'ইদাহ ৫:৪০
তুমি কি জান না যে আল্লাহর নিমিত্তেই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের আধিপত্য। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

তিনি আরো বলেন, আল-মুল্ক ৬৭:১
পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

আল্লাহর এই সুস্পষ্ট ঘোষণাকে উপেক্ষা করে মুরতাদ সরকার তাদের সংবিধানের ৭(১) ধারায় জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক উল্লেখ করেছেন, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।" এটি সুস্পষ্ট শিরকে আকবার।

আশাকরি, এটি এখন আপনাদের নিকট পরিষ্কার যে বর্তমান সরকার একটি মুশরিক ও মুরতাদ সরকার। আর যেহেতু তারা মুসলিমদের গ্রেফতার করে তাদের কারাগারে নিয়ে গেছে সেহেতু এই সকল মুসলিমকে মুক্ত করতে জিহাদ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সবার উপর ফরজে আইন যতক্ষণ না এদেরকে মুক্ত করতে পারি ইনশাআল্লাহ। ওয়া আল্লাহু আলাম।

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বদা তাঁর রাসুলগণকে প্রেরণের মাধ্যমে এই পূর্নাঙ্গতম বিধানকে বাস্তবায়ন করে মানুষের উন্নতি-কল্যাণের ব্যবস্থা করতে থাকেন। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ কিতাব পবিত্র কুরআন প্রদান করে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানে তাঁরই বিধান বাস্তবায়ন করেন এবং এ কুরআন ও সুন্নাতের বিধান পৃথিবীর

অধিকাংশ স্থানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জারি ছিল, অধিকাংশ জায়গায় দ্বীন ইসলামের বিজয় এবং শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা বিদ্যমান ছিল। অপরদিকে কাফির এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের আদর্শিক পতাকা ছিল অবনত।

আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তা পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দূর্ভাগ্য যে, আমাদের খারাপ আমলের কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামী বিধিবিধান ধ্বংস হয়ে গেছে। যার শাস্তি আমরা এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ভোগ করছে। সুতরাং এখনো আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। শরয়ী আইন-কানুন জারি করে দেওয়া উচিত। কেননা, ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় হল, সে রাষ্ট্রে ইসলামী আইন-কানুন তথা কুরয়ান-হাদীসের বিধান প্রতিষ্ঠির থাকবে। রাষ্ট্রের শাসকবর্গ থেকে শুরু করে প্রজাবর্গ পর্যন্ত সবাই উক্ত আইনের পাবন্দী হবে। তারপর এ রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত এবং ওখানকার শাসকবর্গ মুসলমানদের শাসনকর্তা এবং ওখানকার প্রজা মুসলিম প্রজা হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হবে।

যদি মুসলিম শাসকদের তরফ থেকে মুসলিম দেশে ইসলামী আইন জারি না করা হয়, বরং কুফর ও খোদাদ্রোহী আইন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একে আরো উন্নতি প্রদান করা হয়। তখন ঐ দেশসমূহ ইসলামী দেশ হিসেবে কখনো গণ্য হওয়ার উপযুক্ত নয় বরং সেগুলোকে অমুসলিম দেশ হিসেবে সাব্যস্ত করা হবে। কেননা, ইসলামী দেশের পরিচয় ইসলামী আইন প্রয়োগের দ্বারা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, কাফিরদের দেশসমূহ দেখা যেতে পারে- যে দেশে সাম্যবাদ প্রচলিত সে দেশকে কমিউনিস্ট দেশ বলা হয়। কেননা, কমিউনিজম হল রাষ্ট্র পরিচালনার ভিত্তি। গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রচলিত থাকে। এ কারণে সেটিকে গণতান্ত্রিক দেশ বলা হয়। যেখানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বিদ্যমান সেটিকে ধর্ম-নিরপেক্ষ দেশ বলা হয়। সুতরাং কোন ইসলামী দেশের শাসকবর্গ যদি ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা না করেন তবে সে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করার উপযুক্ততা থাকে না। এভাবে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীরা না ইসলামী আইন চায়, না সে আইনের প্রতি সন্তুষ্ঠ, বরং অনৈসলামিক আইনের বাস্তবায়ন চায় এবং সে আইনের প্রতি খুশী, তাহলে এদের মুসলমান বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা নেই। বরং এমন লোক কাফির উপাধী পাওয়ার উপযুক্ত।

এটা বুঝা দরকার যে, কোন ইসলামের দাবীদার কলেমায়ে তায়্যিবাহ পড়ে, নামায পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু ইসলামের অন্যান্য বিধানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না, ইসলামী ইনসাফ এবং ইসলামী রাষ্ট্র অস্বীকার করে, এর দন্ডবিধানের উপর বিশ্বাস রাখে না, কিসাস ও দিয়্যাত অস্বীকার করে, ইসলামের উত্তরাধিকার আইন স্বীকার করে না, ইসলামী বিচার ব্যবস্থা ও সাক্ষ্য গ্রহণ নীতিকে মানে না, এমন ইসলামের দাবীদার কুরআন-হাদীস অনুসারে মুসলমান নয়। বরং এমন ব্যক্তি পাক্কা কাফির ও মুনাফিক। কেননা, দ্বীন ইসলামে সেই ব্যক্তি মুসলমান, যে ইসলামের সব জরুরী এবং অকাট্য বিধানকে মানে এবং স্বীকার করে, আর তাঁর উপর কোন অভিযোগ না করে। আল্লাহর নিকট আমলের ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু আকীদা ও বিশ্বাস সংক্রান্ত ইসলামের বিধান অস্বীকার করা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ’ এই কালেমায়ে তাওহীদ ইসলামের সব বিধানকে বেস্টন করে আছে। এ কালেমায় দু’টো অংশ পরিদৃশ্যমান। কিন্তু শিরোনামে এর সব বিধান এসে যায়। পূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ন্যায় বিচারকদের জন্য এ সামান্য ইশারাই যথেষ্ট।

নফসের জিহাদ বড় জিহাদ!

কেউ কেউ বলেন, নফসের জিহাদ বড় জিহাদ। এ বিষয়ে তারা একটি হাদীসও বর্ণনা করে থাকেন। একদল লোক জিহাদ থেকে ফিরে আসলে নাকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন,

তোমরা খুব উত্তম স্থানেই ফিরে এসেছো তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছো আর তা হলো অন্তরের সাথে জিহাদ করা। (দাইলামী, কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়ামি)

এই হাদীসের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে,

"আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছি।"

এখানে বড় জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নফসের সাথে জিহাদ আর ছোট জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফেরদের সাথে জিহাদ। জিহাদের প্রসঙ্গ আসলেই অনেক ভাইকে উক্ত কথাটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস হিসেবে পেশ করতে শুনা যায়।

কারো কারো কথা থেকে অনুমিত হয়, জিহাদ ছেড়ে শুধু তাসাওউফে লেগে থাকাই শ্রেয়। এটাই যেন হাদীসটির উদ্দেশ্য। অথচ কথাটি বাস্তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস কি না, আর হাদীস হলেও এর উদ্দেশ্যটা কি? এর ব্যাখ্যা কি? আমরা এগুলো তাহক্বীক করি না। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করার জন্যই এই লেখার আয়োজন। সুতরাং এবার আমাদের দেখার বিষয় হল এই হাদীস নামক মন্ত্রটির ভিত্তি কী? এটি কি আদৌ নবীজি (সা)-এর হাদীস?

তাহক্বীক:

১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রঃ) এই হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন,

এই হাদীসটির কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর রসুলের কথা ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এমন কেউ এটি বর্ণনা করেন নি। আর কাফিরদের সাথে জিহাদ করা সর্বত্তোম আমল সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। বরং এটি আল্লাহর ইবাদত সমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (মাজমুউল ফাতাওয়া ১১ খণ্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা)

২. তাসদীদুল ক্বাওস কিতাবের পরিচিতি: ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় "আয যুহদুল কাবীর" কিতাবে এটি উল্লেখ করে লিখেছেন- قال البيهقي هذا إسناد فيه ضعف এটি দুর্বল সনদে বর্ণিত।" [তথ্য, আয যুহদুল কাবীর ১ম খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ৩৮৪]

৩. ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় "আয যুহদুল কাবীর" কিতাবে এটি উল্লেখ করে লিখেছেন- قال البيهقي هذا إسناد فيه ضعف এটি দুর্বল সনদে বর্ণিত।" [তথ্য, আয যুহদুল কাবীর ১ম খণ্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদিস নং ৩৮৪]

৪. ইবনে আররাক (রহ) তাখরীজুল ইহইয়া কিতাবে একে দ্বয়িফ বা দুর্বল বলেছেন। [তথ্য: তাখরীজুল ইহইয়া]

৫. আল্লামা আজলূনী (রহ) তিনিও একে দ্বয়িফ বলেছেন। [সূত্র— কাশফুল খিফা ১/৪২৪]

৬. শায়খ নাছির উদ্দিন আলবানীর মতে এটি মুনকার (منكر) বা অগ্রহণযোগ্য হাদিস। [সূত্র— সিলসিলাতুদ দ্বয়িফাহ ২৪৬০]

৭. আল্লামা তাহের পাতনী (রহ) তাযকিরাতুল মাওদ্বূয়াত কিতাবে একে দ্বয়িফ বা দুর্বল বলেছেন। [সূত্র— তাযকিরাতুল মাওদ্বূয়াত]

৮. আল্লামা তাহের আল হিন্দিঃ তিনি "তাযকেরাতুল মাউজুআত" নামক কিতাবে উল্লেখ করেন: 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম' এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। (মিয়াতু হাদীস মিনাল আহাদীসিদ দয়িফা ১খন্ড ৪ পৃষ্ঠা)

৯. আল্লামা সূয়ুতী (রহ) বলেছেন এটি মারফূ হবার বিষয়ে আমি অবগত নই। তবে এটি অত্যন্ত গরিব একটি হাদিস।

১০. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফি (রহ) আল আসরারুল মারফূয়াহ কিতাবে একে মওদ্বূ বা বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন ।

১১. শায়খ ইবনে উছাইমিন (রহ) 'শরহুল মুমাত্তি' (الشرح الممتع) কিতাবে উল্লেখ করে একে দ্বয়িফ ও অশুদ্ধ বলেছেন এবং 'মাজমূ ইবনে উছাইমিন' কিতাবে একটি ফাতওয়ায় একে অত্যন্ত দ্বয়িফ বা মাওদ্বূয়া (বানোয়াট) বলেও উল্লেখ করেছেন। [সূত্র- মাজমূ ইবনে উছাইমিন' ২৭/৪৯৮] ।

১২. অপর বিজ্ঞ আলেম আল্লামা আবু যুরা'আহ (রহ) এ বর্ণনাকারীর হাদীস থেকে সকলকে বিরত থাকার জন্য প্রকাশ্যে ঘোষনা দিয়েছে। উল্ল্যেখিত হাদীসের অপর একজন বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে আ'লা যার সম্পর্কে ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল (রহ) বলেন, এ লোকটি বড় মিথ্যাবাদী। সে হাদীসকে মনগড়া ভাবে বর্ণনা করত। ইমাম ইবনে আদী (রহ) বর্ণনা করেন এ ব্যক্তির সমস্ত হাদীস মনগড়া, জাল ও ভিত্তিহীন।

পরিশেষে বলা যায় যে, এটি অত্যন্ত দ্বয়িফ বা একটি জাল হাদিস।

১৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ)- ভাষ্য মতে—

"এটা লোক মুখে প্রসিদ্ধ, যা ইবরাহীম ইবনে আবী আবলাহ নামীয় ব্যক্তির উক্তি। (এটি নবীজির হাদিস নয়।)" । (আদ্দুরারুল মুনতাছির: ১/১১, আল আহাদীস লা তাসিহহু, ১/৫, কাশফুল খিফা ১/৪ ২৪)

তবে সহীহ হাদীসে আছেঃ
"মুজাহিদ সেই যে তার নাফসের সাথে জিহাদ করে।" (সুনান তিরমিজি)
অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে

"সর্বত্তোম জিহাদ হলো আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে অন্তরের সাথে জিহাদ করা।" (জামউল জাওয়ামি, কানযুল উম্মাল)

এই সহীহ হাদীস দুটির সাথে উপরে উল্লেখিত হাদীস দুটির পার্থক্য হলোঃ এখানে সরাসরি অন্তরের জিহাদকে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের তুলনায় বড় জিহাদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। শুধু বলা হয়েছে অন্তরের জিহাদ সর্বত্তোম জিহাদ। এখন

প্রশ্ন হলো অন্তরের জিহাদ বলতে আমরা কি বুঝবো? আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে অন্তর যা অপছন্দ করে অন্তরের অপছন্দ সত্বেও সেটা আদায় করাই কি অন্তরের জিহাদ নয়? যদি তাই হয় তবে আল্লাহ নিজে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন,
"তোমাদের উপর কিতাল ফরজ করা হয়েছে যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়।" (সূরা বাকারা/২১৬)

অন্য কোনো আমলের ব্যাপারে আল্লাহ একথা বলেননি সুতরাং যত উত্তম কাজ আছে তার মধ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মানুষের অন্তরের নিকট সর্বাপেক্ষা বেশি অপছন্দনীয় তাই যারা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করছেন তারাই অন্তরের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশি জিহাদ করছেন।

নিসার ৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট বলেছেন, যারা জিহাদ করে আর যারা ঘরে বসে থাকে উভয়ে সমান হতে পারে না। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের 'দারাজাহ' অনেক উঁচু। ইবনে তাইমিয়া রহ. 'মাজমূউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (১১/১১১) উক্ত হাদিসকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে বলেন-জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল। এরপর অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে জিহাদের ফযিলত বেশি হওয়া সংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস পেশ করেন।

এখানে লক্ষণীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে, নফসের সাথে মুজাহাদা করার প্রয়োজন সাধারণত নফসের অপছন্দ বস্তুর ক্ষেত্রেই হয়; নফস চায় এগুলো করতে তখন খুবই কষ্ট করে নফসকে বারণ করতে হয়। আর জিহাদ হচ্ছে নফসের কাছে খুবই অপছন্দনীয় এবং অপ্রিয়। আল্লাহ তাআলা সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন-

'তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে অথচ এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।'

তাই যারা জিহাদ করবে একই সাথে তাদের নফসের সাথেও জিহাদ হচ্ছে আবার কাফেরদের সাথে শারীরিক জিহাদ হচ্ছে। সুতরাং যারা কাফেরদের সাথে জিহাদে যায় নি তাদের একথা বলার সুযোগ নেই, যারা জিহাদে রয়েছে তাদের তুলনায় আমরা বড় জিহাদ নিয়ে বসে আছি।

আল্লামা ইবনে নুহহাছ (রহ) এর বক্তব্য: ইমামূল মাগাজী আল্লাম ইবনে নুহহাছ (রহ) তার প্রসিদ্ধ জিহাদগ্রন্থ "মাশারীউল আশওয়াক্ব ইলা মাসারীউল উশশাক্ব" কিতাবের ভূমিকায় উল্লেখ করেন, ইসলামের চির দুশমন কাফির-মুশরিকরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা তাদের আত্মারক্ষার জন্য এবং আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদকে মূল হাতিয়ার হিসেবে অবলম্বন করেছে। যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জিহাদ প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন কোথাও হাটুগেড়ে বসার সুযোগ পাবে না। কেননা জিহাদের বরকতে ও আল্লাহর সাহায্যে মুসলমান মাত্র কম সময়ে অর্ধ-দুনিয়াকে বিজয় করে নিয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষা নিয়ে ইসলামের দুশমনরা কয়েক বছর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হল যে, জিহাদের মিশনকে ভেঙ্গে দিতে পারলে বা কোন ভাবে তা কমজোর করতে পারলেই সফলতায় পৌছে যাবে। তারা এই অসাধ্য সাধনে মরিয়া হয়ে উঠলো, তারা সর্বশক্তি বির্সজন দিয়ে নিজেদের মিশনে সফলতা লাভ করতে চাইল। কিন্তু সকল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা এক নতুন সুক্ষ ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। আর তাহলো, মুসলমানদের মাঝে প্রবেশ করে জিহাদকে "আসগার" বা ছোট জিহাদ ও "আকবার" বা বড় জিহাদ রুপে বিভক্ত করে দিল। নফসের সাথে জিহাদকে বড় জিহাদ ও দুশমনের মোকাবিলায় যুদ্ধ করাকে ছোট জিহাদ হিসেবে সাব্যস্ত করল।

ইসলামের দুশমনরা তাদের এ মিশনে পরিপূর্ণ সফলতা লাভের জন্য এ বাক্যটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দিল এবং এর নিসবত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে করে দিল। কারণ তারা জানে মুসলমানদের নিকট অতি সহজে একটি বিষয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে নিসবত করাই সর্বাধিক সহজ পথ। বাক্যটিকে হাদীস হিসেবে দাঁড় করালো। অথচ এ বাক্যটিকে বাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে নিসবত করা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাছাড়া হাদীসের কোন কিতাবে এই বাক্যটি সরাসরি হাদীস হিসেবে উল্ল্যেখ নেই। ভিত্তিহীন এ

হাদীসের প্রভাব সাধারণ মুসলমানদের উপর এমন ভাবে পড়েছে যে, তারা নফস ও শয়তানের সাথে মোকাবিলাকে বড় জিহাদ হিসাবে আঁকড়ে ধরেছে, এবং কাফেরদের সাথে কৃত ছোট জিহাদকে পরিত্যাগ করে পার্শ্ব অবলম্বন করে নিয়েছে। যিকির –ফিকিরের সাথে তাসবীহ হাতে নিয়ে ইবাদতে এমন মশগুল হয়েছে যে, দুনিয়া কাফেরদের জন্য খালি করে দিয়েছে আর এ যুগে সমস্ত কুফরী শক্তি দুনিয়ার মসনদ গুলো দখন করে নিয়েছে। মুসলমান আবদ্ধ হয়েছে গোলামীর জিঞ্জিরে।

সুতরাং এই জাতীয় একটি ভিত্তিহীন, জাল হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে পীর-সূফীগণ মূলত: মুসলিম জাতিকে জিহাদ থেকে বিরত রেখে কাফের-মুশরিক, ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্বসহ সকল কুফফারদেরকেই সাহায্য করে যাচ্ছে। নতুবা যে জিহাদ আল্লাহ নিজে করেছেন, ফেরেশতারা করেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। যে জিহাদ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের যুদ্ধে দান্দান শহীদ করলেন। সত্তর জন সাহাবী শহীদ হলেন। হুনাইনের যুদ্ধে মাথা ভেঙ্গে রক্তাক্ত হলেন। বদরের যুদ্ধে চৌঁদ্দজন সাহাবী শহীদ হলেন। যে যুদ্ধ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। সেই যুদ্ধকে ছোট জিহাদ বলা আর নফসের জিহাদকে বড় জিহাদ বলা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

জিহাদ কি শুধু রক্ষণাত্মক?

কাফেরদের চক্রান্তে পা দেয়া আরেক দল জ্ঞানপাপী প্রচার করে যে, জিহাদ শুধুমাত্র রক্ষাণাত্মক - এটি আক্রমণাত্মক নয়। এদের এই বক্তব্য আল্লাহর কুরআন, রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ ও মুসলিমদের গৌরবময় ইতিহাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেন:

তোমরা যুদ্ধ করতে থাক আহলে কিতাবের ঐ লোকদের বিরুদ্ধে, যারা ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, এবং অনুসরণ করে না প্রকৃত সত্য দ্বীন, যে পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে, স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে। [সূরা তাওবা: ২৯]

রাসূল (সা) বলেন:

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি যতক্ষণ না তার সাক্ষ্য দেয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ এবং তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে...। [বুখারী]

রাসূল (সা) হুনায়নের যুদ্ধে হাওয়াজিন আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন এবং মুতার যুদ্ধে রোমানদের আক্রমণ করতে সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন। এগুলো সবই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। বস্তুত রাসূল (সা)-এর জীবনে সংগঠিত ২য় হিজরীর বদর থেকে শুরু ৯ম হিজরীর তাবুক পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধই ছিল আক্রমণাত্মক।

হযরত আল্লামা ইদরিস কান্দলভী (রহ) এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন যে, "রাসূলে কারীম (সা) কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত অধিকাংশ যুদ্ধসমূহ ছিল আক্রমণাত্মক (offensive) এবং প্রতিরোধাত্মক (defensive) ছিল কম। অনুরূপভাবে ইসলামী খলীফা ও রাষ্ট্রপ্রধানগণের অধিকাংশ অভিযান ছিল আক্রমণাত্মক এবং তাৎক্ষণিক। যেসব লোক বলে যে ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ নেই, শুধু প্রতিরোধাত্মক জিহাদ আছে, তারা হল কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃতকারী এবং বুজুর্গদের

অতীত ইতিহাস গোপনকারী। বাতিলের ভয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত এসব মানুষের কোনো বক্তৃতা বা লেখার ওপর আস্থা রাখা উচিত নয়। [আল্লামা মোহাম্মদ ইদরিস কান্দলভী, "দসতুর-ই-ইসলাম", লাহোর, পৃষ্ঠা: ৩০]

সাহাবীদের যুগেও আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমেই ইরাক, পারস্য, শাম, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা বিজয় হয়েছে। তাই আক্রমণাত্মক জিহাদের বিষয়ে সাহাবীদের ইজমাও সুস্পষ্ট। স্পেন, ভারতবর্ষ, এমন কি বাংলাদেশও সাহাবীদের পরবর্তী যুগের আক্রমণাত্মক জিহাদের মাধ্যমেই ইসলামের পতাকাতলে এসেছিল।

ইনশাআল্লাহ পরবর্তী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আক্রমণাত্মক জিহাদের যাত্রা আবার সত্যিকার অর্থে শুরু হবে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে শাহাদাতের পতাকা উড়বে ইনশাআল্লাহ।

জান্নাত তরবারীসমূহের ছায়ার নিচে। [বুখারী]

জান্নাতের দরজাগুলো তরবারীসমূহের ছায়ার নিচে। [মুসলিম]

যে ব্যক্তি যুদ্ধে কখনো অংশ নেয়নি এবং মনে মনে তার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ না করে মারা যায়, সে মুনাফিকত্বের একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করলো। [মুসলিম]

এই যুগের কলমের জিহাদই মূল জিহাদ ' এটা কতটুকু সঠিক??

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য তরবারি (অসি) দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

“যতক্ষণ না মানুষ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহের সাক্ষ্য না দিবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে মানুষের সাথে কিতাল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।”

আর এটা তো জানা কথা যে, সবাই ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ’ গ্রহন করবে একেবারে কিয়ামতের পূর্বে, ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর। অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত কিতাল চলবে। আর কিতাল যে অসি তথা অস্ত্র দিয়েই হয়, কলম দিয়ে হয় না, এটা এই দুনিয়ায় শিশুরাও বুঝবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

অর্থাৎ, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ রয়েছে তা হলো সওয়াব ও গনিমত।
কিন্তু ঘোড়া দ্বারা এই দুনিয়ার কোন যুদ্ধের ময়দানে লিখা হয়? ঘোড়া দ্বারা করা যায় কিতাল। তাহলে অসি (তথা অস্ত্র) যুদ্ধ এখনি নয় – কথাটির মাহাত্ম কি?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেনঃ

আমার উম্মতের মাঝে সর্বদা হক্কের উপর যুদ্ধরত একটি দল অব্যাহত থাকবে, তাদের বিরোধিতাকারীদের উপর তারা বিজয়ী থাকবে।

বহু সংখ্যক হাদিসে এই তায়েফাতুল মনসুরাহ বা বিজয়ী দলের একটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টভাবে ক্বিতাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলে যদি এখন অসির যুগ না থাকে, তা হলে এই সত্যপন্থী দলটি কিভাবে ক্বিতাল করবে? ক্বিতাল তো কলম তথা মসি, যুক্তি-তর্ক কিংবা বক্তৃতা ইত্যাদি দিয়ে করা যায় না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। (সূরা আহযাব, আয়াতঃ ২১)

জিহাদের পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে আমল করে দেখিয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তদানুসারে পথ চলেছেন। উম্মত জিহাদের একটি রূপ উপলব্ধি করে আসছে। যেমন ‘ছালাত’ যখন বলা হয় তখন একটি রূপ মানসপটে ভেসে ওঠে, এর মধ্যে কারো কোন সংশয় থাকে না। অর্থাৎ কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদাহ, তাহারাত এর মাধ্যমে যা আদায় করা হয় সেই ছালাতকেই সবাই বুঝেন। কেউ সালাত আদায় করেছে বলতে দুয়া করা বুঝায় না। অথচ দুয়া অর্থেও সালাত শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। ‘হাইয়া আ’লাস ছালাহ’ শুনলে কেউ এটা বুঝেনা যে, মসজিদে গিয়ে দুরুদ শরীফ পড়ে আসলেই হবে। অথচ দুরুদ শরিফকেও কোরআনে ছালাত বলা হয়েছে (শাব্দিক অর্থে)। জিহাদের হলো তাই যা তীর, ধনুক, তরবারী, ঘোড়া, বর্ম এগুলোর মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সময়ের ব্যবধানে এগুলোর ধরন পরিবর্তন হতে পারে – যেমন বন্দুক, গুলি, বোমা, ড্রোন, ইত্যাদি তবে যুদ্ধ সর্বদা যুদ্ধই থাকবে – যুদ্ধ কখনো লিখনি কিংবা ভাষন হয়ে যাবে না। সে যুগেও লিখনি ছিল কিন্তু এটাকে কেউ যুদ্ধ বলেননি।

হ্যাঁ কিতালের প্রতি উৎসাহ প্রদান, বিরোধীদের দলিল খণ্ডন, কৌশল প্রণয়ন এগুলো যা কিতাল তথা যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট – এগুলোকেও ফুকাহায়ে কেরাম জিহাদ এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর মূলতঃ মুখ, কলম ইত্যাদির দ্বারা যে জিহাদ আছে, তা এটাই।

কিতাল তথা যুদ্ধ হল সশস্ত্র লড়াই, জিহাদ তার চেয়ে একটু ব্যাপক। অর্থাৎ জিহাদ হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত যে কোন কর্মকাণ্ড, প্রস্তুতি, উৎসাহ প্রদান, হত্যা-চিন্তা, যুদ্ধের পরিকল্পণা প্রণয়ন ইত্যাদি। দ্বীন বিজয়ের নিয়্যতে যে কোন চেষ্টা – এটা পরিভাষায় জিহাদ নয়, শাব্দিক জিহাদ হতে পারে। আর শাব্দিক জিহাদ কখনো জিহাদের আহকাম, ফযিলত, প্রভাব, তাসির কিংবা ফল বহন করে না। যেমনঃ স্ত্রী সহবাস কে শাব্দিক অর্থে জিহাদ বলা হয়।

অর্থাৎ, যখন তোমাদের কেউ (স্ত্রীর) চার শাখা (হাত-পা) এর মাঝে বসে তারপর ‘জিহাদ’ করে, তার জন্য গোসল ওয়াজিব।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

(পিতা-মাতা) যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়ে শরীক স্থির করতে ‘জিহাদ’ করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না। (সূরা লোকমান, আয়াতঃ ১৫, সূরা আনকাবুত: ৮)

এখানে বলা হচ্ছে কাফের মাতাপিতা যদি তোমাদের শিরক করার জন্য চূড়ান্ত চাপ প্রয়োগ করে তাদের কথা শোন না। এখানে কাফেরের পক্ষ থেকে চাপ প্রয়োগকে জিহাদ শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন কি বলা হবে যে এ কাফের মাতা পিতা দ্বারা জিহাদ হয়েছে? তারা মুজাহিদ? জিহাদের ফযিলত তারা পাবে? এর দ্বারা দ্বীন বিজয়ী হবে?

ইহুদিদের স্বভাব পারিভাষিক অর্থ ও শাব্দিক অর্থের ব্যবধান না মানা । যেমনঃ ابناء শব্দটি পারিভাষিক ভাবে ‘প্রিয়’ এর অর্থ বহন করে, ইহুদি-খ্রিস্টানরা এটাকে শাব্দিক অর্থ গ্রহন করে, তারা বলে যে আমরা আল্লাহ্’র সন্তান। নাউজুবিল্লাহ! কি জঘন্য কাজ।তারা পরিভাষাকে গুলিয়ে ফেলার কারনে تحريف করার কারণে শিরক পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। যারা বসে

বসে কলমের খোঁচায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রক্ত ঝরা দান্দান শহীদ হওয়া জিহাদকে গুরুত্বহীন করে দিচ্ছেন, তাদের রাসুলের বিরোধিতার কারণে কোন ফিতনায় পড়ে যাওয়া অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাবে আক্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করা উচিত।

হামযা (রাঃ) টুকরো টুকরো হয়েছেন যে জিহাদে, সাহাবায়ে কেরামের শতকরা আশি ভাগ যে জিহাদে শহীদ হয়েছেন, কোরআনের সাড়ে চারশত এর অধিক আয়াতের মধ্যে যে জিহাদের আলোচনা করা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতাশটির উপরে জিহাদি অভিযানে সৈন্য পরিচালনা করেছেন, অর্ধ শতকের উপরে জিহাদে সাহাবায়ে কেরামকে পাঠালেন – সে জিহাদ কারো কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে!! আবার কারো নিকট এটা জঙ্গিবাদ!!

নাউজুবিল্লাহ!

সার কথাঃ জিহাদ অর্থ কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ, জিহাদকে অস্বীকারকারী কাফির, অপব্যখ্যাকারী গুমরাহ, পরিত্যাগকারী ফাসেক। (ছরখছী)।

কিতালের মাধ্যমেই দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হবে, ফিতনাহ তথা শিরক, শিরকের প্রভাব প্রতিপত্তি খতম হবে।

হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কলম-সৈনিক তৈরী হয়ে গেলেও দ্বীন বিজয়ী হবে না, যতক্ষণ না দ্বীন বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ গ্রহন করা হবে। সে পথ কি? আল্লাহ পাকের স্পষ্ট ঘোষণাঃ

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (সূরা আনফালঃ ৩৯)

ফিতনাহ শেষ হওয়া আর পরিপূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়া নির্ভর করে কিতালের উপর। কিতাল কঠিন, অপছন্দনীয়, কষ্টকর। বিজ্ঞ হাকিম কি আমাদেরকে এমন কষ্টের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন আরও সহজে অসুখ নিরাময় হবার পথ বাদ দিয়ে? অথচ তিনি আরহামুর রাহিমীন। তাহলে এবার চিন্তা করুনঃ ফিতনা দূরীভূত হবার, দ্বীন প্রতিষ্ঠা হওয়ার আর কোন সহজ পদ্ধতি থাকতে পারে কি?

আমাদের ইয়াকিন হলো – না, আর নেই। থাকলে সেটা দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন। কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ্* রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। (সূরা বাকারাঃ ২১৭)

কাফেররা দ্বীন থেকে ফিরানোর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করবে? – কিতাল।

এখন দ্বীন রক্ষায় কি করণীয়? কিতাল এর মুকাবেলায় কি রুমাল কিংবা কলম নিয়ে মুখোমুখি হওয়া? নাকি শত্রু যেভাবে আসবে তেমন ধরনের হাতিয়ার নিয়ে যাওয়া? হ্যাঁ, শত্রু কলমের আগ্রাসন, সাংস্কৃতিক আক্রমণ, অর্থনৈতিক হামলা সব প্রয়োগ করছে কিন্তু এগুলো সবই সামরিক শক্তির অধীন। সামরিক বিজয় যার থাকবে এসব শক্তি তার পক্ষেই কাজ করবে। আজ কুফফারদের সামরিক বিজয় বিদ্যমান বিধায় এসব ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবী তাদের অনুসারী।

মানুষ তার রাজন্যবর্গের মতাদর্শ গ্রহণ করে থাকে। সুরায়ে নাসর এর বক্তব্যও এর সমর্থন করে। নতুবা পশ্চিমাদের সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা কি ইসলামের চেয়ে উন্নত যে কারণে মুসলমানরা পর্যন্ত তাদের আদর্শগুলো গ্রহণ করছে? এটা তাদের সামরিক বিজয়ের প্রভাব। নতুবা লেখনীর / বক্তব্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিকট রয়েছে কিতাবুল্লাহ এর মতো

মুজিযা। এর চেয়ে বড় লেখা / বক্তব্য পৃথিবীর সমুদয় লেখক-বক্তা কিয়ামত পর্যন্ত লিখে, বক্তৃতা দিয়ে এর ধারে কাছেও কি পৌঁছাতে পারবে? বাস্তবে লিখার ক্ষেত্রে আমাদের বিজয় বিদ্যমান।

এতদসত্বেও কোরআনের আদর্শ, বিধিবিধান, হুকুম-আহকাম কেন স্বয়ং মুসলিমরাই গ্রহণ করছে না? আপনি কোরআনের চেয়ে বেশি লিখে ফেলবেন? আরও উন্নত বক্তব্য দিয়ে ফেলবেন? পারবেন না। কিন্তু কোরআন মানা হচ্ছেনা কেন? সমাজে নামাজ নেই কেন, যাকাত নেই কেন, বরং সমাজে সুদ বিস্তৃত হচ্ছে কেন? নামাজ ফরজ এটা মানুষ জানে না এ কারণে, নাকি এর দাওয়াত পৌঁছে নাই একারণে? নাকি রাফে ইয়াদাইনের ঝগড়ার নিস্পত্তি না হওয়ার কারনে?

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেনঃ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। (সূরা হজ্ব, আয়াতঃ ৪১)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইকামতে ছালাত হবে ক্ষমতা লাভ হলে। আল্লাহ বলছেন, মুমিনরা যদি ক্ষমতা পায় তখন ছালাতের প্রচলন করে আর আমাদের কেউ কেউ বলছে 'এর জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন নাই'। নাউজুবিল্লাহ!

ক্ষমতা আসলে কিভাবে কিতাব প্রতিষ্ঠিত হবে? আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদীদ, আয়াতঃ ২৫)

দ্বীনের সাহায্য করার উপায় হলোঃ লোহা-অসি-অস্ত্র দিয়ে। মসিহ আলাইহিস সালাম দাজ্জালকে দমন করবেন অসি হাতে নিয়েই।

আল্লাহ পাক নবী অলিদের, ফিরিশতাদের দিয়ে কিতাল করিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ মিশনেই ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কে এ পথেই রেখে গেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম এ পথেই অর্থাৎ অস্ত্র-সরঞ্জাম সহ পৃথিবীর দিকে দিকে এগিয়ে গেছেন। বিজয় এনেছেন। উম্মতের একটি জামাতের কিতালের মাধ্যমে এ বসুন্ধরা ইসলামের আলোয় আলোকিত হয়েছে। কুফর অপসারিত হয়েছে। ধীরে ধীরে আমরা সে পথ ছেড়ে আরামের পথ ধরে, এখন নানাবিধ ব্যারামে ভুগছি। যতক্ষণ সে পথ ফের না ধরবো, সেই ব্যারাম সারবে না।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

যখন তোমরা ঈনা (সন্দেহযুক্ত) কেনাকাটা শুরু করবে, গরুর লেজ ধরবে, ফসল ফলানো নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, আর জিহাদ ছেড়ে দিবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দেবেন তা সরাবেন না যতক্ষণ তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে না আসবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস সহীহ)

এখানে দ্বীনের দিকে ফেরত আসা বলতে হাদিসের ইমামগণ জিহাদ বুঝেছেন। সুতরাং, ''অসি তথা অস্ত্রযুদ্ধ এখনই নয়, এখন মসি (কলম তথা যুক্তি-তর্ক কিংবা বক্তৃতা) যুদ্ধের সময়'' – এসব কথা নফসের খায়েশাত ছাড়া আর কিছু নয়। এসব কথার পক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি, নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি, নিশ্চয়ই নিক্ষেপের মধ্যে আছে শক্তি। (সহীহ মুসলিম, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনে মাজাহ, সুনান তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

দেখা যাচ্ছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিক্ষেপের তথা তীর, অসি, বন্দুক ইত্যাদির মধ্যে আছে শক্তি। কিন্তু এরকম সুস্পষ্ট হাদিস থাকার পরও কিভাবে আমরা 'মসীযুদ্ধ অসির চাইতে মারাত্বক' – এই ধরনের কথা বলতে পারি?! বরং আল্লাহ আমাদেরকে জিহাদের প্রস্তুতির জন্য ঘোড়া ও শক্তি সঞ্চয় করতে বলেছেন।

"আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সামর্থ অনুযায়ী সংগ্রহ করো শক্তি-সামর্থ্য ও পালিত ঘোড়া ..." (সূরা আল আনফাল, আয়াতঃ ৬০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জিহাদের জন্য মুসলমানদেরকে বড় বড় লেখক, সাংবাদিক হতে বলেন নি। কলমের ব্যবহারকে বেশী শক্তিশালী বলেন নি। বরং শক্তি ও ঘোড়া জোগাড় করতে বলেছেন।আমরা কলমের গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না, মিডিয়ার গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না, মানুষের মন-মানষিকতা পরিবর্তনে লেখনীর গুরুত্বকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু শরীয়াতে প্রত্যেক বিষয়ের একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। সেটাকে তার চাইতে বেশী আগে বাড়িয়ে দিলে, সমস্যা দেখা দেয়। বরং প্রত্যেকটা বিষয়কে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছেন, ততটুকু দেয়াই উচিত।

বরং আল্লাহ বলছেন, কাফিররা চায়, আমরা যেন আমাদের অস্ত্র সম্পর্কে বেখবর হয়ে যাই, আর শুধু মসী-কলম ইত্যাদি নিয়ে পড়ে থাকি, যাতে তারা আমাদের উপর সহজে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম উম্মাহ এখন এই অবস্থার সম্মুখীন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনঃ

কাফিররা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং সরঞ্জামাদি থেকে গাফিল হও যাতে তারা তোমাদেরকে একযোগে আক্রমন করতে পারে। (সূরা আন নিসা, আয়াতঃ ১০২)

এই ব্যাপারে আমাদের কথা হলোঃ ইজতিহাদ হয় আল-কোরআন ও হাদিসের আলোকে একটি নতুন সমস্যার সমাধান দেবার সময়। কিন্তু 'আল-জিহাদের অর্থ কিংবা সংজ্ঞা' তো আজ চৌদ্দশত বছর পর নতুনভাবে দেয়া হচ্ছে না, কিংবা এটা নতুন কোন বিষয়ও নয় যে এর উপর কেউ এখন ইজতিহাদ করবে।বরং যুগে যুগে আলিমরা এই ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে কথা বলে গেছেন। তাই জিহাদ কাকে বলে, এর অর্থ কি – এসব ব্যাপারে কোন ইজতিহাদের স্থান নেই। তাই মন্তব্যকারীর এই মন্তব্য গ্রহনযোগ্য নয়।

আর কলমের মাধ্যমে জিহাদের ব্যাপারটা ইমাম কাসানী (রঃ) এর সংজ্ঞায় এসে গেছে। তিনি বলেছেনঃ"শরীয়াতের পরিভাষায় (জিহাদ হলো) নিজের জীবন, সম্পদ, মুখ ও অন্যান্য যা কিছু দিয়ে সম্ভব তার মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য শক্তি ও ক্ষমতা উৎসর্গ করা"। তাই মুখ, কলম ইত্যাদি দিয়ে জিহাদে শরীক হওয়া যাবে তবে সেটা হতে হবে কিতাল ফি সাবিলিল্লাহর (সম্মুখ যুদ্ধের) সমর্থনে। কিন্তু ক্বিতালের সাথে সম্পর্কহীন কলমের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত দাওয়াহ, তারবীয়া-তাসফিয়া, আমরে বিল মারুফ-নাহি আনিল মুনকারের অংশ হতে পারে কিন্তু জিহাদের অংশ হবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামী শরীয়াতের আলোকে জিহাদকে বুঝার ও জিহাদে সামিল হবার তৌফিক দান করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি নিজে গাযওয়াতে (যুদ্ধের জন্য বের হওয়া) যায়নি কিংবা গাযওয়াতে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেনি, সে নিফাকের একটি শাখার উপর মৃত্যু বরণ করলো। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাম সিন্দী (রঃ) সুনান নাসায়ীর হাশিয়াতে বলেন, 'এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সে জিহাদের যাবার নিয়্যত করে নি। আর জিহাদে যাবার নিয়্যত থাকার প্রমাণ হলোঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেছেনঃ

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। (সূরা আত তাওবা, আয়াতঃ ৪৬)

আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে নিফাকের শাখায় মৃত্যু হতে হিফাজত করেন।

আগে ঈমান পরিপূর্ণ করি পরে জিহাদে বের হব!

অনেক ভাইয়েরা বলে থাকে যে, আগে ঈমানের উপর মেহনত করে ঈমানকে পরিপূর্ণ করি। ঈমান যখন মজবুত ও পরিপূর্ণ হবে তখন আমরা জিহাদে যাব।

আর না হয় যদি ঈমানে দুর্বলতা থাকে বা ঈমান পরিপূর্ণ না থাকে তাহলে জিহাদে যাওয়ার পরে ঈমানের দুর্বলতার কারণে শত্রুর ভয়ে জিহাদ থেকে পলায়ন করার আশঙ্কা রয়েছে। আর জিহাদ থেকে পলায়ন করা কবিরা গুনাহ এবং জিহাদ থেকে পলায়নকারীর উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা রাগান্বিত হন। ঈমান পরিপূর্ণ করা ছাড়া জিহাদে গেলে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে, গুনাহও হবে আবার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা-ও রাগ করবেন। কাজেই আগে ঈমান পরিপূর্ণ করি পরে জিহাদে যাব। যারা এসব কথা বলে তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন!

১. কতদিন ঈমানের মেহনত করলে ঈমান পরিপূর্ণ হবে? শরীয়ত কি দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর নির্ধারণ করে দিয়েছেন?
২. ঈমান কতটুকু থাকলে পরে ঈমান পূর্ণ হয়?
৩. কিভাবে বুঝবেন ঈমান পূর্ণ হয়েছে কি না? জিহাদে বের হয়ে নাকি না হয়ে? আপনাদের কথামত ঈমান পূর্ণ হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য হলেও তো জিহাদে যাওয়া প্রয়োজন। ঈমান পরীক্ষার জন্য হলেও কি জিহাদে গিয়েছেন?
৪. প্রচলিত তাবলীগে যে ভাইয়েরা বছরের পর বছর লেগে আছে তাদের ঈমান কি পরিপূর্ণ হয় নি?
৫. যে ভাইয়েরা প্রচলিত তাবলীগ করতে করতে মৃত্যু বরণ করেছে জিহাদের যায়নি, তাদের ঈমান কি পূর্ণ হওয়া ছড়াই মৃত্যু বরণ করেছেন? তাদের ব্যাপারে কি বলবেন?

৬. সাহাবায়ে কেরাম কতদিন ঈমানের মেহনত করেছিলেন? যদি বলেন তের বছর মক্কায় ঈমানের মেহনত করে, মদিনায় পরে জিহাদ করেছেন (যদিও একথার কোন ভিত্তি নেই) তাহলে বলব, যে সাহাবারা মদিনায় ঈমান এনেছে তারা কত বছর ঈমানের মেহনত করেছেন? এমনও সাহাবা আছেন যারা ঈমান গ্রহণ করে অন্য কোন ইবাদত করার তেমন সুযোগ হয়নি এমনকি এক ওয়াক্ত সালাত ও। তারাও জিহাদে গিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন, তাদের ব্যাপারে কি বলবেন?

৭. কোরআন এবং হাদীসের কোথায় আছে যে, যতটুকু ঈমান নিয়ে অন্য সব ইবাদত করতে পারেন ততটুকু ঈমান নিয়ে জিহাদে যেতে পারবেন না?

আসল কথা হল যে, তারা জিহাদে যেতেই চায়না বরং জিহাদ থেকে পলায়ন করাই উদ্দেশ্য। এমন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা সূরা আহযাবের ১৩ নং আয়াতে কত সুন্দর করেই না বলেছেন,

"তাদের একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পালায়ন করাই ছিল তাদের তাদের উদ্দেশ্য" আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা তাদের কথা কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন, যারা নবীর কাছে এসে জিহাদে না যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইত।

এবং মিথ্যা ওজুহাত দেখাত যে, আমদের বাড়ী-ঘর খালি রেখে আমরা কিভাবে জিহাদে যাব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলছেন না, তাদের ঘর-বাড়ী খালি না বরং জিহাদের না যাওয়ার জন্য এসব তাদের মিথ্যা ওজুহাত।

ঠিক তেমনিভাবে এখনও একশ্রেণীর লোক ঈমানের দুর্বলতার ওজুহাত দিয়ে জিহাদে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে চায়। তার ভাবে জিহাদে না গিয়ে অন্যান্য ইবাদত করে ঈমানকে পূর্ণ করে নিবে। তাদের বুঝা উচিৎ যে, জিহাদে যাওয়ার দ্বারাই ঈমান বৃদ্ধি পায় ঈমান পূর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা এমনই বলেছেন,

"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সরঞ্জাম জমা করেছে; তাদের ভয় কর। তখন তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেল এবং বলে আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৩) ।

অন্য আয়তে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেছেন,

"যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণ বৃদ্ধি পেল"। (সূরা আহযাব, আয়াত ২২) ।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, জিহাদের ময়দানে শত্রুদের দেখে ঈমান বেড়েই যায়, ঈমান বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাজেই ঈমানের দুর্বলতার কথা বলে জিহাদ থেকে দূরে থাকার কোন কারণ নেই। বরং ঈমানে দুর্বলতা থাকলে এবং ঈমান পূর্ণ না থাকলে জিহাদে গিয়ে ঈমানের দুর্বলতা দূর করে ঈমানকে পূর্ণ করাই হল ঈমানের দাবী।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা আমাদের কে সঠিক বোঝ দান করুণ! আমিন!

ঈমান মজবুত হবে কবে?

যদি কেউ ফজরের নামাজ আদায় না করে । পরে সে চাইল জুহর নামাজ পড়তে, তখন কি আমরা বলি যে, "ভাই! তুমি ফজরেরে নামাজ পড়নি, তোমার ঈমান মজবুত হয়নি, তাই তোমার জুহরের নামাজ হবে না?

.

কেউ যদি নামাজের ব্যাপারে খুব উদাসীন থাকে এমনকি সাপ্তাহে জুমআর ছাড়া আর কোন নামাজই পড়ে না। এখন সে হজ্ব করতে চায়, তখন কি আমরা বলি যে, "ভাই! তুমি তো নামাজের ব্যাপারে খুব উদাসীন তোমার ঈমান দুর্বল, তাই তোমার আর হজ্ব আদায় হবে না?

.

যদি কেউ নামাজ ও রোযার ব্যাপারে খুব উদাসীন থাকে কিন্তু সে মাদ্রাসায় দান-খায়রাত করতে চায়, তখন কি আমরা বলি যে, "দোস্ত! তোমার নামাজ-রোযার ক্ষেত্রে খুব উদাসীনতা আছে তোমার ঈমান এখনো পাকা হয়নি, তাই তোমার সাদাকাহ হবে না? এ দানে মাদ্রাসার ক্ষতি হবে? এই কথা কি বলি?

.

আমরা অবশ্যই এমনটা বলি না। কেন এরকম বলি না? কারন উপরের কোন ইবাদতই অন্য ইবাদাতেরউপর নির্ভরশীল নয়।

.

কিন্তু কেউ যদি বলে, আমি জিহাদ করতে চাই, তখন দেখবেন আমাদের অনেকেই বলে উঠবে, "এই মিয়া!!! তোমার ঈমান এখনো দুর্বল, তুমি কিভাবে জিহাদ করবে? আগে ঈমান মজবুত করো।

.

যারা এরকম বলেন, তাদের প্রতি পুর্ন শ্রদ্বা রেখেই বলছি। আচ্ছা! জিহাদ করতে হলে ঈমান মজবুত করতে হবে এটা কোথায় পেলেন? কুরয়ান-হাদিস থেকে একটু উদৃতি দেন তো দেখি! (?) আমরাও শিখি। কতটুকু আ, আল করলে একজন মুসলমানের ঈমান মজবুত হয়? ঈমান তো আমাল দ্বারাই মজবুত হয়, তাই না? জিহাদ তো জিজেই একটা আমাল, বরং শ্রেষ্ট আমালগুলোর একটি । এর দ্বারাও তো ঈমান মজবুত হতে পারে। তাহলে এ ক্ষেত্রে এত বাধা কেন?

.

এবার আসুন!!! রাসুল (সাঃ) এর কিছু সীরাত পাঠ করি। তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) যখন ৮ম হিজরির রামাদান মাসের ১৭ তারিখ মক্কা বিজয় করেন তখন মুসলিম সংখ্যা ছিল ১০ হাজার। আর যখন মক্কা বিজয়ের ১৯দিন পর ৮শাওয়াল হুনাইন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ১২হাজার।

.

মক্কা বিজয়ী মুসলমানদের সংখ্যা থেকে ২হাজারের বেশি যাদেরে প্রায় সবাই নওমুসলিম ছিলেন। এখানে আমাদের প্রশ্ন হল, এই ২হাজার মুসলিম তারা কখন ঈমান মজবুত করার সময় পেলেন? মাত্র ১৯দিনেই তাদের ঈমান মজবুত হয়ে গেল?

.

যে ঈমান মজবুত করতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী প্রমুখ সাহাবিদের (রাঃ) লেগে ছিল প্রায় ১৮ বছর । আর সে ঈমান তারা মাত্র ১৯দিনেই মজবুত করে ফেললেন? তাহলে কি এই সাহাবিদের ইমানের চেয়েও বেশি মজবুত ছিল তাদের ঈমান?

.

ওহুদ যুদ্ধের পুর্বমুহূর্তে 'উসাইরিম' নামের এক সাহাবি ইসলাম গ্রহন করেন, এর পরেই তিনি উহুদ যুদ্বে তিনি শহিদ হয়ে গেলেন। নবী কারীম সঃ বলেন, সে আমাল কম করলেও তার সওয়াব অনেক বেশি। আর-রাহিকুল-মাখতুম।

.

আচ্ছা, এই সাহাবী ঈমান মজবুত করতে কতটুকু সময় পেলেন?

দেখুন, আমরা এই কথা বলছি না যে, জিহাদের জন্য আমাল দরকার নেই। আমরা বলি, যেভাবে একজন ফাসেকের নামাজ আর নেকেকারের নামাজের মধ্যে পার্থক্য আছে, ঠিক তদ্রুপ একজন ফাসেকের জিহাদ আর নেকেকারের জিহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেভাবে নামাজের রিয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক তদ্রুপ জিহাদের মধ্যেও রিয়ার আশংকা আছে। রিয়ার দরুন কি আমরা নামাজ বাদ দিয়ে দেই? তাহলে রিয়ার জন্য হলেও কেন আমরা জিহাদের ক্ষেত্রে এত আপত্তি করি?

.

আমরা শুধু বলতে চাই, জিহাদ করতে হলে যে, হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ দের মত ঈমান আনতে হবে, এটা কোথায় আছে?

.

মনে রাখুন! জিহাদ না করা বা না করতে পারা এক বিষয়, আর জিহাদের বিরোধিতা করা ও এর বাধা দেওয়া আর বিকৃত করা অন্য বিষয়। পাকিস্তানের মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান হাফিজাহুল্লাহ (যিনি আপনাদের মতই একজন মুবাল্লিগ) কত চমৎকারই না বলেছেনঃ

“যদি মৌলভি জিহাদের বিরোধিতা করে, তাহলে বেচারা কাদিয়ানি কী দোষ করেছিল যে, সে জিহাদকে অস্বীকার করে?”

রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ করা যায় কিনা?

সৌদি রাজপরিবারের ভক্ত তথাকথিত অনেক আলেম জিহাদের জন্য একটা আজব শর্ত যোগ করেনঃ তা হলো জিহাদের জন্য নাকি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকা জরুরী।

প্রথমতঃ এসব ‘আজব আলেম’দের পূর্বে কোন সলফে সালেহীন এ রকম ‘আজব কথা’ বলেন নি।

তারা অনেক ব্যাপারে সলফে সালেহীনদের অনুসরণের দাবী করলেও জিহাদের ক্ষেত্রে সলফে সালেহীনদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সৌদি রাজার গুনগ্রাহী আলেমদেরকে অনুসরণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই একত্রিত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দলীল হলো সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আবু বছীর (রাঃ) এর ঘটনা। যেখানে বলা হয়েছে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর যখন মক্কা থেকে পালিয়ে আসা মুসলমানদেরকে মদীনা থেকে মক্কায় ফেরত দেওয়া হলো। সে সময় আবু বছীর (রাঃ) মদীনাতে পালিয়ে আসেন। তখন কাফিরদের পক্ষ থেকে দুজন দূত তাকে নিতে আসলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেন। পথিমধ্যে তিনি তাদের একজনকে হত্যা করেন এবং আবার মদীনাতে ফিরে আসেন। তাঁকে দেখে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

‘কি আশ্চর্য! এ তো যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সক্ষম। যদি এর সাথে কেউ থাকতো!’

এ কথা শুনে আবু বছীর (রাঃ) বুঝতে পারেন যে, তাকে আবার মুশরিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তাই তিনি বের হয়ে পড়েন এবং সিফাল বাহর নামক এলাকাতে অবস্থান নেন। পরবর্তীতে মুসলমানরা একেরপর এক মক্কা থেকে পালিয়ে এসে আবু বছীর (রাঃ) এর সাথে মিলিত হতে থাকেন। তারা মক্কার যে কোনো ব্যবসায়ী কাফেলার কথা শুনলে তার উপর

হামলা করে তাদের হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ কেড়ে নিতেন। পরে কুরাইশরা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট পত্র লিখে সন্ধির উক্ত শর্তটি বতিল করার অনুরোধ জানায়। (সহীহ বুখারী)

এই হাদীসে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়,

বিশ্ব নেতা বা খলীফা অনুপস্থিত না থাকলে বা তাঁর সাথে যোগাযোগ সম্ভব না হলে স্থানীয়ভাবে আল্লাহর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করা যায়। কেননা আবু বছীর বা অন্য যেসব সাহাবা উক্ত স্থানে একত্রিত হয়েছিলেন তাদের কেউই খলীফা ছিলেন না। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকতে এমন দাবী কখনই যৌক্তিক হতে পারে না। আবার তারা মদীনা রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিকও ছিলেন না। তাহলে তারা কুরাইশদের সাথে মদীনা রাষ্ট্রের সন্ধিকে মানতে বাধ্য থাকতেন। তারা যা করেছেন সে বিষয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নির্দেশ দেন নি। এসকল সাহাবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রিত ভূখন্ড ছিল না। এসবই স্পষ্ট প্রমাণ করে যে জিহাদ করার জন্য একজন খলীফা থাকতে হবে বা রাষ্ট্র থাকতে হবে এটা শর্ত নয়।

অনেকে বলতে পারেন এ ঘটনা একদল সাহাবাদের আমল বর্ণনা করে এটা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বা কাজ নয়। এর উত্তর হলো রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ খবর পৌঁছেছিল কিন্তু তিনি এর নিন্দা করেননি। তাছাড়া রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা,

যদি এর সাথে কেউ থাকতো!

এই অংশের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আল আসকালানী (রঃ) বলেন,

যদি তার সাথে কেউ থাকতো অর্থাৎ যদি তাকে কেউ সাহায্য ও সহযোগীতা করতো। ইমাম আওযাঈ (রঃ) এর রেওয়ায়েতে আছে যদি তার সাথে কিছু লোক থাকতো। এই কথাটি আবু বছীর (রাঃ) কে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে তিনি ফিরে গেছেন। এই কথার মধ্যে ইঙ্গিতে তাঁকে পালিয়ে যেতে বলা হয়েছে যাতে তাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে না হয় এবং মক্কার অন্যান্য মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট এই কথা পৌঁছায় তাকে আবু বছীরের সাথে মিলিত হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শাফিঈ মাযহাব ও অন্যান্য বেশিরভাগ আলেমরা বলেছেন (সন্ধি থাকা অবস্থায়) এধরনের কথা আকার ইঙ্গিতে বলা যেতে পারে যেমনটি এই ঘটনায় রয়েছে তবে সরাসরি নয়। (ফাতহুল বারী)

তৃতীয়তঃ রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াও যে জিহাদ ফরজ হয় এ বিষয়ে আর একটি দলীল হলো উবাদা ইবনে সমিত (রাঃ) বর্ণিত হাদীস,

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমান বিদ্যমান আছে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

এই হাদীসের ভাষ্য হলো ক্ষমতাশীন খলীফা বা বাদশা যদি কুফরীতে লিপ্ত হয় তবে তখনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ওয়জিব হবে।

ইমাম নববী (রঃ) বলেন,

কাজী ঈয়াদ বলেছেন আলেমরা ইজমা করেছেন যে, কোনো কাফির মুসলিমদের ইমাম (খলীফা) হতে পারে না আর যদি পরবর্তীতে কোনো খলীফা কাফির হয়ে যায় তবে তাকে পদচুত করতে হবে। (শরহে মুসলিম)

এখন একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরুন মুসলিম জাহানের একজন খলীফা রয়েছেন। মুসলিমরা তার আনুগত্য করে চলেছে। এখন যদি হঠাৎ উক্ত খলীফা কাফির হয়ে যায় এবং অস্ত্র বলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশ হলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এখানে রাষ্ট্র ক্ষমতা কিন্তু উক্ত মুরতাদ শাসক ও তার সমর্থকদের দখলে আর মুসলিমরা রাষ্ট্র ক্ষমতাহীন। একজন কাফিরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে হটিয়ে একজন মুসলিমকে সে স্থানে বসানোর জন্য মুসলিমরা যুদ্ধ করবে। তাহলে এ হাদীস এবং উম্মতের ইজমা থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়াই জিহাদ শুধু বৈধ নয় বরং ওয়াজিব প্রমানিত হচ্ছে।

যারা মনে করেন হাদীসে কেবল খলীফা মুরতাদ হয়ে গেলে তাকে অপসারনের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য মুরতাদ শাসকদের অপসারনের প্রয়োজন নেই। এটা যেমন একদিকে হাদীসের শব্দের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক অন্যদিকে যুক্তির দিক থেকেও হাস্যকর। হাদীসে বলা হয়েছে,

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হবো না যতক্ষন না তারা স্পষ্ট কুফরীতে লিপ্ত হয় যে বিষয়ে আমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে প্রমান বিদ্যমান আছে।

প্রথমে বলা হয়েছে (وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ) আমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে লড়াই করবো না। এখানে খলীফা (خليفة) বা খিলাফত (الخلافة) শব্দ ব্যাবহার করা হয়নি বরং (الامر) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ ক্ষমতা আর (أهل الأمر) শব্দের অর্থ ক্ষমতাসীন। এক কথায় হাদীসের প্রথম অংশে যে কোনো ধরনের ক্ষমতাসীনদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে (إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا) যতক্ষন না তোমরা স্পষ্ট কুফরী দেখতে পাও। তাহলে ক্ষমতাসীন যে কারো মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখলে পেলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হচ্ছে। সে খলীফা হোক বা বাদশা হোক বা জন্মগতভাবেই কাফির হোক।

এখন যদি কেউ বলেন হাদীসে তোমরা ক্ষমতাশীনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা বলতে ক্ষমতাসীন খলীফাকে বুঝানো হচ্ছে। এবং স্পষ্ট কুফরী দেখতে পেলে যুদ্ধ করার যে বৈধতা দেওয়া হয়েছে সেটাও খলীফা যখন কুফরী করে তখন প্রযোজ্য, অন্য শাসকদের ক্ষেত্রে নয়। তাদের জন্য কথা হলোঃ যদি হাদীসের প্রথম অংশে ক্ষমতাশীনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়োনা বলতে শুধু খলীফাকে বুঝানো হয় তাহলে তো খলীফা ছাড়া অন্যান্য শাসকদের সাথে যুদ্ধ করা এমনিতেই প্রমানিত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ হাদীসের অর্থ হবে ক্ষমতাশীন খলীফার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ো না যতক্ষন না তার মধ্যে কুফরী দেখা যায়। আর অন্যান্য শাসক যারা খলীফা নয় তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো সময়ই যুদ্ধ করতে পারো। একটু চিন্তা করলেই বিষয়টি বোঝা যাবে।

জিহাদের জন্য একজন সর্বজনীন খলীফা বা বিশ্বনেতা থাকা কি শর্ত, নাকি স্থানীয়ভাবে আমীর নিয়োগ করে জিহাদ করা যায়?

সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফা বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ছাড়া জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আমরা পূর্বে কথা বলেছি। এখন প্রশ্ন হলো কোনো কারণে যদি সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এক নেতার অধীনে একত্রিত হতে সক্ষম না হয় তবে তাদের করণীয় কি? সকলে একত্রিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, নাকি একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করার পাশাপাশি শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবে?

প্রথমতঃ এ বিষয়ে সঠিক উত্তর পূর্বে বর্ণিত আবু বছীর (রাঃ) এর ঘটনাতে পাওয়া যাবে। যখন মক্কার কাফিরদের সাথে কৃত সন্ধির কারণে মদীনা রাষ্ট্রের সাথে মিলিত হওয়া সম্ভব হলোনা তখন তাঁরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে স্থানীয়ভাবে শত্রুর মোকাবিলা শুরু করে দিলেন। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের এ কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। বর্তমানেও

যদি কোন কারণে মুসলিমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তবে তাদের করণীয় হলো একতাবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা এবং সেই সাথে যে যেভাবে পারে স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা চালিয়ে যাওয়া। আল্লাহ বলেন,

হে ঈমানদাগণ! তোমরা নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো আর তাদের প্রতি কঠোর হও। জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (সূরা তাওবাঃ ১২৩)

দ্বিতীয়তঃ যারা জিহাদ বৈধ হওয়ার জন্য খলীফার বিদ্যমান থাকাকে শর্ত করেন তাদের জন্য উহুদ যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে শিক্ষনীয় কাহিনী বিদ্যমান রয়েছে।

আনাস (রাঃ) এর চাচা আনাস ইবনে নাদর (রাঃ) উমর ইবনে খত্তাব, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ এবং অন্য কিছু মুহাজির ও আনসারদের নিকট পৌঁছালেন। তারা অস্ত্র ফেলে দিয়ে বসে পড়েছিলেন। তিনি বললেন তোমরা বসে আছো কেনো? তাঁরা বললেন আল্লাহর রাসুল নিহত হয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে? ওঠো! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কারণে জীবন দিয়েছেন তোমরাও সে কারণে জীবন দাও। তারপর তিনি চলে যান এবং যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। (বাইহাকী দালাইলুন নুবুওয়া, সিরাতে ইবনে হিশাম, সিরাতে ইবনে কাছীর ইত্যাদি)

একটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আনাস ইবনে নাদর (রাঃ) বলেছিলেন,

হে আমার সমপ্রদায়! যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েই থাকেন, তবে অনেক মুহাম্মাদই তো জীবিত রয়েছে। তিনি যে বিষয়ের উপর যুদ্ধ করেছেন তোমরাও তার উপর টিকে থেকে যুদ্ধ করে যাও। (ফাতহুল বারী, তাফসীরে তাবারী)

অর্থাৎ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হলেও জিহাদ বন্ধ করা হবে না, কারণ আল্লাহর রাসুলের জন্য জিহাদ করা হয় না, বরং জিহাদ করা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, যদি খলীফা বিদ্যমান না থাকে বা নিহত হন, তবে জিহাদ পরিত্যাগ করা হবে না।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ বলেন,

মুহাম্মাদ তো একজন রাসুল মাত্র, তার পূর্বেও বহু রাসুল গত হয়েছে। অতএব যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পিছনে ফিরে যাবে? (আলে ইমরানঃ ১৪৪)

অন্য একটি রেওয়ায়েতে এসেছে,

আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রথম যে তরবারী উত্তোলন করা হয়েছে তা যুবাইর ইবনে আওয়ামের তরবারী। একদিন তিনি দুপুরে বিশ্রামরত অবস্থায় ছিলেন তখন একটি আওয়াজ শুনলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন। তিনি দ্রুত খোলা তরবারী হতে বের হয়ে পড়লেন। পরে একস্থানে তার সাথে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেখা হলে, তিনি (সাঃ) বললেন, হে যুবাইর! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন আমি শুনলাম আপনাকে হত্যা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে কারণে তুমি কি করতে চাচ্ছিলে? যুবাইর (রাঃ) বললেন, আমি মক্কার কাফিরদের দেখে নিতে চাচ্ছিলাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন। (কানযুল উম্মাল, জামউল জাওয়মি)

এখন খলীফা নিহত হওয়ার খবর শুনলে মুসলিমদের কি করা উচিত? যারা খলীফাকে হত্যা করে পালাচ্ছে তাদের পিছু ধাওয়া না করেই কি মুসলিমরা আর একজন খলীফা নিয়োগে মনোনিবেশ করবে? খলীফার কারণে কি ইসলামের যাবতীয় কাজকর্মে ইস্তফা দিতে হবে? ইসলাম কি শুধু খলীফার জন্য?

চতুর্থতঃ যারা মনে করেন শত্রুর সাথে মুকাবিলা করার পূর্বে সমগ্র মুসলিমদের একজন খলীফার নিকট বায়াত হতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই স্থানীয়ভাবে একত্রিত হয়ে জিহাদ করা বৈধ হবে না, তাদের নিকট আমাদের প্রশ্নঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য নবীগণ জিহাদ করেছেন কি না? তাঁরা জিহাদ করে থাকলে তাদের জিহাদ বৈধ ছিল কি না? কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আমাকে পাঁচটি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেওয়া হয়নি।

এরপর শাফায়াত, গনিমত ইত্যাদি বিষয়গুলি উল্লেখ করে সবার শেষে বলেন,

আর আমার পূর্বে সকল নবীকে তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে প্রেরণ করা হতো আর আমাকে সমস্ত মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো নবীকে সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়নি, বরং নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বহু সংখ্যক নবী তাদের অনুসারীদের নিয়ে আশপাশের কাফিরদের সাথে লড়াই করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

কতো নবী রয়েছেন যাদের সাথে বহু সংখ্যক নেককার বান্দা যুদ্ধ করেছে! (সূরা আলে ইমরানঃ ১৪৬)

পঞ্চমতঃ হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, 'আমরা ক্ষতির মধ্যে ছিলাম পরে আপনার মাধ্যমে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়েছি। এই কল্যাণের পর আবার কোনো অকল্যাণ হবে কি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যা।' তিনি (রাঃ) বললেন, 'তার পর আবার কোনো কল্যাণ আসবে কি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যা, তবে তাতে কিছু ধোঁয়া থাকবে।' এভাবে কয়েকবার প্রশ্ন করার পর একসময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কোন অকল্যাণ হবে কি না এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,

'হ্যাঁ। একদল লোক জাহান্নামের দরজার দিকে ডাকবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে তাদের তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।' হুযাইফা (রাঃ) বলেন, "আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! তাদের বৈশিষ্ট কি?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তারা আমাদের মতো হবে। আমাদের ভাষায় কথা বলবে।' আমি বললাম, 'আমি যদি সে সময় পাই, তবে আমাকে কি করতে আদেশ করেন?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি মুসলিমদের জামাত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরো।' 'আমি বললাম, যদি তখন মুসলিমদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, 'তবে গাছের শিকড় কামড়িয়ে হলেও মৃত্যু পর্যন্ত ঐ সকল দল হতে দূরে থাকো।'" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

হাদীসটির শেষে বলা হয়েছে,

যদি তাদের কোনো জামাত বা ইমাম না থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তুমি শিকড় কামড়ে হলেও জাহান্নামের দিকে যারা ডাকছে তাদের সাথে মিলিত হয়ো না।' অর্থাৎ, যখন মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায় আমি আবার বলছি যদি মুসলিমদের কোনো দল বা জামাত না পাওয়া যায় তখন বাতিল ফিরকা থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু যদি মুসলিমদের

কোনো জামাত পাওয়া যায় যাদের সাথে মিলিত হয়ে দ্বীনের খেদমত করা সম্ভব, তাহলে তাই করতে হবে। জামাত অর্থ দল। মুসলিমদের জামাত অর্থ মুসলিমদের দল। একদল মুসলিম একত্রিত হয়ে কোন কাজ করতে চাইলে সেই দলটিকে মুসলিমদের জামাত বলা যেতে পারে। তাদের নাম যাই হোক, আর তাদের সংখ্যা যতই হোক। তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ হোক। তাদের কাজ ও দাওয়াত যদি সঠিক হয় এবং যারা জাহান্নামের দিকে ডাকছে তাদের মতো না হয়, তবে তাদের সাথে মিলিত হতে হবে। যেমনঃ আল্লাহ বলেন,

যখন তোমরা পানি না পাও, তখন পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম করো। (সূরা মায়েদাঃ ৬)

এই আয়াতে অর্থের ব্যাপারে সমস্ত আলেমরা একমত যে, পানি থাকা পর্যন্ত তায়াম্মুম করা যাবে না। তবে পানি যদি নাপাক হয় বা অন্য কোনো দোষে দুষ্ট হয় তবে ভিন্ন কথা। এখন যদি কেউ বলে, সমুদ্র যেহেতু বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত তাই সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো পানি দ্বারা ওযু করা যাবে না তবে তার কথাটি কেমন হবে? তার কথার উত্তরে বলা হবে, ওযু করার জন্য শর্ত হলো পানির প্রয়োজনীয়তা, তা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হোক বা একটি হ্রদের পানিই হোক। একইভাবে সত্য পথের দিকে আহবানকারী একদল মুসলিম পাওয়া গেলে তাদের সাথে একত্রে কাজ করতে হবে, তারা বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হোক বা আসহাবে কাহফের মতো কোনো ছোট গুহাতে আশ্রিত হোক। আবু বছীর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের কর্মনীতি থেকেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়। জিহাদের জন্য রাষ্ট্র, খিলাফত ইত্যাদিকে যারা শর্ত করেন, তারা সম্পূর্ণ বাড়তি বিষয় যোগ করেন যার কোনো দলীল নেই। এটা ঠিক যে, মুসলিমরা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাফেরদের পক্ষ হতে আরোপিত বাধা-বিঘ্নের কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি তারা বিশ্বব্যাপী একতাবদ্ধ হতে সক্ষম না হয়, তবে যতদিন একতাবদ্ধ হওয়া সম্ভব না হয়, ততদিন কাফেরদের সুযোগ দিতে হবে- এমনটি নয়। বরং স্থানীয়ভাবে কোনো একজন আমীরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হয়ে কাফেরদের মুকাবিলা করতে হবে, এবং সর্বদা অন্য হক্বপন্থীদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমনটি আবু বছীর (রাঃ) ও তার সঙ্গী-সাথীদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সাথে মিলিত হতেই চাচ্ছিলেন, কিন্তু কাফিররা তাঁদের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাঁরা আল্লাহর রাসুলের (সাঃ) সাথে মিলিত হওয়ার পূর্বেই সেই বাধাদানকারী কাফেরদের উপর আক্রমণ করতে থাকলেন। জিহাদ নিজেই একটি ওয়াজিব দায়িত্ব। খলীফা না থাকলে যেমন নামাজ, রোযা পরিত্যাগ করা হয় না, তেমনি জিহাদও পরিত্যাগ করা হবে না। ইবনে কুদামা (রঃ) বলেন,

যদি ইমাম না থাকে, তবু জিহাদ পিছিয়ে দেওয়া হবে না। কেননা এর ফলে জিহাদের কল্যাণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। যদি কোন গনীমত পাওয়া যায়, তবে মুজাহিদগণ শরীয়ত অনুসারে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেবে। (মুগনী)

কারা হক্ব দল?

ইবনুল কায়্যিম রহঃ বলেন- আবু মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ইবনে ইসমাঈল যিনি আবু শাম্মাহ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি কতইনা উত্তম কথা বলেছেন তাঁর কিতাব আল-হাওয়াদিস ও বিদ'আর মধ্যে! তিনি বলেছেন- {শরীয়ায় যেখানেই জামাতকে আকড়ে ধরার কথা এসেছে, সেখানেই তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হক ও হকের অনুস্বারীদেরকে আকড়ে ধরা। যদিও হককে আঁকড়ে ধরে রাখার লোক কম হয় এবং তার বিরুদ্ধাচারণকারী বেশী হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন- জামাআত সেটাই যেটা হকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এমনকি যদি তুমি একা হও তবুও ।

অর্থাৎ, কেবল হকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই তা জামা'আ। এমনকি যদি হকের সাথে আপনি শুধু একাই সামঞ্জস্যপূর্ণ হন তাহলে আপনি একাই একটা জামা'আ। অপরদিকে অবশিষ্ট সবাই হকের সাথে না থাকার কারণে তারা সবাই একসাথে থাকা সত্ত্বেও জামা'আ না।

এখানে একটা বিষয় সহজে বুঝে আসেনা, আর তা হলো একা আবার জামা'আ হয় কিভাবে?

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- যখন একটি হক জাম'আ ভেংগে যায়, তখন জামা'আ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্বে যে হক নীতির উপরে ছিলো, সে হক নীতির উপর যে বর যারা থাকবে সে তাঁরা জামা'আ। সুতরাং, এখন যদি কেউই হক নীতিকে অনুস্মরণ না করে কেবল আপনি একাই করে থাকেন- তাহলে এক্ষেত্রে আপনি একাই জামা'আ।

এবার প্রশ্ন হতে পারে আমরা কিভাবে হক জমা'আকে চিনবো? কিভাবেইবা বুঝবো যে এটা হক জামা'আ?

হক জামা'আকে চেনার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা পবিত্র কোরআনে হক জামা''র কিছু গুণ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতালা এরশাদ করেন-

হে ঈমানদারেরা! তোমাদের মধ্য যে আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, [তাহলে শুনে রাখো!] আল্লাহ তা'আলা এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন [যারা আল্লাহর দিন থেকে বিমুখ হবেনা। বরং]

১। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ভালোবাসবেন। ২। তাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসবে। ৩। তাঁরা মুমিনদের প্রতি সদয় হবে ৪। তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে ৫। তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে ৬। এবং আল্লাহর রাহে লড়াই করা অবস্থায় তাঁরা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবেনা। [সূরা মায়েদাঃ ৫৪]

প্রিয় ভাই! লক্ষ করুন!! আয়াতে কি বলা হচ্ছে-

১। ঈমানদার বান্দাদেরকে সম্বোধন করা।

২। তাদের মধ্য হতে কারো দিন থেকে বিমুখ হওয়া।

৩। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এমন একটি জাতিকে নিয়ে আসা যারা দীন থেকে বিমুখ নয়। বরং তাঁরা হক তথা দীনের পক্ষে।

৪। এবং সে হক জাতি তথা জামা'আর কি কি গুণ থাকবে তা।

নিশ্চয় তারা হক হতে পারেনা, যাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা দীন থেকে বিমুখ বলেছেন। আর দীন থেকে বিমুখ কারা? আল্লাহ তা'আলা বলছেন- যাদের ভেতরে এই ৬ টি গুণ নেই তারাই হচ্ছে দীন থেকে বিমুখ। এবং হক ও দীনের পক্ষের লোক হচ্ছে তাঁরা যাদের ভেতরে এই ৬ টি গুণ রয়েছে।

সুতরাং, আসুন এবার দেখে নেয়া যাক এই ৬ টি গুণ কাদের মাঝে পাওয়া যায়-

১। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাদেরকে ভালোবাসবেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন-

নিশ্চয়ই! আল্লাহ ভালোবাসেন সেসকল লোকদেরকে, যারা তাঁর রাহে কিতাল করে সারিবদ্ধ অবস্থায়। মনে হয় যেনো তারা সীসাঢালা প্রাচীর। [সূরা সফঃ ০৪]

ফরয ইবাদাত সমূহের এই একটির ক্ষেত্রেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এমন ভালোবাসার দাবী উপস্থাপন করেছেন।

সুতরাং, ভালোভাবে এই দলটিকে চিনে নিন।

২। তাঁরাও আল্লাহকে ভালোবাসবে।

মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন-

হে নবী আপনি বলে দিন! যদি তোমাদের মাতা-পিতা, ভাইগণ, স্ত্রীগণ, স্বগোত্র, উপার্জিত মাল, সে ব্যবসা যা ভেঙে যাওয়ার ভয় করো, এবং সেসব বসবাসের বাড়িঘর, যাতে তোমরা বসবাস করতে ভালোবাস; এগুলো যদি তোমাদের নিকট বেশি প্রিয় হয় আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ হেদায়েত দান করেন না ফাসেক সম্প্রদায়কে। [সূরা তাওবাঃ ২৪]

প্রিয় ভাই প্রায় সকল দল ও মতের মানুষই দাবী করে থাকে যে, তাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নিজের প্রকৃত আশেকের পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে- আমাকে ভালোবাসার প্রমাণ হচ্ছে আমার রাসূলকে ভালোবাসা। আর আমার রাসূলকে ভালোবাসার প্রমাণ হলো আমার রাস্তায় জিহাদ করা। আর যে ব্যক্তি এপ্রমাণ ছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসার দাবী করবে সে মিথ্যাবাদী, ফাসেক।আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ফাসেক সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

উক্ত আয়াতে আপনি কাদেরকে হক হিসেবে খুঁজে পাচ্ছেন?

৩। তাঁরা মুমিনদের প্রতি সদয় হবে।

জী! তাঁরা মুমিনদের প্রতি সদয় হবে। তাঁরা তাঁদের মুমিন ভাই-বোনদেরকে উদ্দশ্য করে বলবে –

"নিশ্চয়ই! তোমাদের রক্ত, তা আমদেরই রক্ত। তোমাদের চোখের অশ্রু, তা আমাদের চোখেরই অশ্রু। তোমাদের মুখের হাসি, তাতো আমাদের মুখেরই হাসি।"

তাই যখন বিশ্বের কোন প্রান্তে যদি তোমাদের রক্ত ঝরে, তখন আমরা আমাদের কিতাবগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারিনা। বসে থাকতে পারিনা আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যস্ততা নিয়ে। আর এটাইতো হাদিসের ভাষ্য।

আর পক্ষান্তরে যারা মুমিনদেরকে এমন করুণ অবস্থায় দেখেও চুপ থাকে, যারা এখনো একথার সাক্ষী পেশ করতে পারেননি যে, গোটা উম্মাহ এক দেহের ন্যায়, তাই পৃথিবীর কোথাও মুসলিম উম্মাহ আঘাত পেলে, সেটির প্রতিষেধকের কথা তারা ভাবেনা; বরং একথা বলে বেড়ায় যে, আমরা ভালো আছি!

আশ্চর্য! যারা উম্মাহর কঠিন দূর্যোগে ভালো থাকে! আনন্দে থাকে!! তাদেরকে কিভাবে উম্মাহর উপর সদয় বলা যেতে পারে? আমি একান্ত বাধ্য হয়েই বলছি! মুজাহিদিনদের ছাড়া অন্য কারো মাঝে এগুণটি এখনো অনুভব করছিনা।

৪। তাঁরা কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে।

দুনিয়ার তুচ্ছ সার্টিফিকেট এর বিনিময়ে তাগুতের গলায় মালা পড়িয়ে অবশ্যই কঠোর হওয়া সম্ভব নয়। বরং এটা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের প্রমাণ। তাদের গোলামির দলিল।

দেখুন কাফেরদের সাথে কঠোরতার পদ্ধতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলে দিয়েছেন-

অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে। যখন তাঁরা তাঁদের [মুশরিক] জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলো- নিশ্চয়ই! আমরা সম্পর্কহীনতা ধোষণা করছি তোমাদের সাথে ও তোমাদের দেবতাদের সাথে। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। সৃষ্টি হলো আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ চিরকালের জন্য। আর এটা চলতে থাকবে যাবত না তোমার এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করো। [সূরা মুমতাহিনাঃ ০৪]

কেউ যদি কুফফারদের সাথে কঠোরতা করতে চায়, তো এভাবেই করতে হবে। আর এর শেষ হবে কিতালের দ্বারা তাকে হত্যার মাধ্যমে। এটার ফায়সালা এবার পাঠকের কাঁধে!!

৫। তাঁরা আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা এরশাদ করেন-

যারা ঈমানদার তাঁরা এক আল্লাহর পথেই কিতাল করে। আর যারা কাফের তারা কিতাল করে তাগুতের পথে। সুতরাং, তোমারা কিতাল করতে থাকো শয়তানের দুসরদের সাথে। [সূরা নিসাঃ ৭৭]

জী! তাঁরা আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে। এবং আল্লাহর দেখানো পথেই জিহাদ করবে। তাঁরা অবশ্যই আব্রাহামের দেখানো পথে জিহাদ করতে যাবেনা। কারণ, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে তাঁরা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করবে। আর যারা আব্রাহামের পথে জিহাদ করবে তারা আব্রাহামের দীনকে বিজয়ী করতে চাবে। এটাই বাস্তসম্মত কথা। আর আমরা আজ অবধি এটাই দেখে আসছি, যারা গণতন্ত্রকে দীন কায়েমের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে, তারা দীন কায়েম করতে পারেনি ১% ও! কিন্তু গণতন্ত্রকে কায়েম করেছে ১০০%! তবে সাবধান! যারা মুফতি নন, তারা কিন্তু গণহারে তাকফির শুরু করবেন না আবার! ওটা মুহতারাম মূফতি সাহেবানদের কাজ। তাঁরা যেটা যেভাবে ভালো মনে করেন করবেন ইনশাআল্লাহ।

মুহতারাম আখি! এখানে এসে তালিবান, আল-কায়েদা ও সঠিক মানহাজের উপর কিতালকারীদের ছাড়া অন্য কাউকে কল্পনা করা কি জায়েজ হবে?

৬। এবং তাঁরা জিহাদ করতে গিয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবেনা।

যাদের মাঝে জিহাদ নেই তাদের তো নিন্দুকও নেই। তাহলে নিন্দার পরওয়া করার তো কোন ঝামেলাই তাদের নেই। তারা ট্রাম্পের কাছেও সাবাস পায়। আবার মুমিনদর কাছেও ভালো সেজে থাকতে চায়।

কিন্তু নিন্দুকের অভাব নেই তালেবান আর আল-কায়েদার। ঘরের লোকে নিন্দা করে, বাহিরের লোকেও নিন্দা। দুস্তও নিন্দা করে, আবার দুশমনও নিন্দা করে । সবাই জঙ্গি বলে গালি দেয়। কেউ বলে গুমরাহ হয়ে গেছে, আবার বক্তব্য বেশি বুঝে ফেলেছে। মানুষ এগুলো বলছে কেন? কারণ, এটাই যে, তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদকে বেছে নিয়েছে। আর এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আয়াতে সুস্পষ্ট করে বলেছেন- তাঁরা জিহাদ করতে গিয়ে নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবেনা। তাঁরা কারো নিন্দায় জিহাদকে ছেড়ে দেবেনা।

ইমাম তাঈমিয়া রাহিমাহুল্লাহ'র একটি উক্তি যদি আপনি হক্কদল চিনতে না পারেন তাহলে কাফের মুশরিকদের দিকে তাকান দেখুন তারা কাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং কাদেরকে নিধন করার জন্য তারা সর্বশক্তি ব্যয় করছে এবং কাদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়রা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তা দিনের আলোর মতই পরিস্কার। মনে হয়না আমাকে আর হক্ক পরিচয় করিয়ে দেয়া লাগবে।
হক্ক চিনলো কাফের মুশরিকরা আফসোস হল অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনার পরও হক্ক চিনতে পারল না। কাফের মুশরিকরা বাতিলের বিরুধীতা করেনা কারন তারা জানে যে বাতিল মানেই তাদেরই একজন অথবা তাদের অধীনস্থ গৃহপালিত পশু। কাফের_মুশরিকরা- মাযহাব বিদ্বেষী নয়, আহলে হাদিস বিদ্বেষী নয়, ইলিয়াসি তাবলীগ বিদ্বেষী নয়, জামায়াত বিদ্বেষী নয়, হেফাজত, খেলাফত, জমিয়ত বিদ্বেষী নয়, মসজিদ মাদ্রাসা বিদ্বেষী নয়, পীর/মাজার বিদ্বেষী নয়, ইজতেমা বিদ্বেষী নয়, কিন্তু তারা জঙ্গি (দ্বীনের মুজাহিদ) বিদ্বেষী।

কাফের_মুশরিকরা- সালাত বিদ্বেষী নয়, সিয়াম বিদ্বেষী নয়, হজ্ব বিদ্বেষী নয়, যাকাত বিদ্বেষী নয়, কিন্তু তারা জিহাদ ও ক্বিতাল বিদ্বেষী।

কাফের_মুশরিকদের সাথে মুজাহিদদের শত্রুতা কোথায়?
মুজাহিদগন চায় বাতিল নিশ্চিহ্ন করে হক্ব প্রতিষ্ঠা করতে। [বাক্বারা-১৯৩/আনফাল-৩৯/তাওবা-৩৩] আর কাফের মুশরিকরা চায় মুখের ফুৎকারে রবের নুরকে নিভিয়ে দিতে এই হল শত্রুতার মুল কারন। [তাওবা-৩২/সফ-৮]
মুজাহিদগন কাফেরদের দ্বীনকে ধ্বংস করে রবের দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য রাসুল সাঃ এর তরিকায় ক্বিতাল করে যাচ্ছে তারাই হল হক্বদল। রাসুল সাঃ বলেছেন আমি ও আমার সাহাবীগন যে আকিদা ও আমলের উপড় থাকবে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। অর্থাৎ তারা ক্বিতাল পার্টি, তারা কেয়ামত পর্যন্ত ক্বিতাল করে যাবে। [মুসলিম-৬৩৬১/তিরমিযী-২৬৪০]

এবার আপনি সমগ্র বিশ্বের মুমিনদের সকল দলের উপর ইনসাফের চোখ বুলান। ইনশাআল্লাহ! আপনার ইনসাফী দৃষ্টি অবশ্যই আপনাকে হক দলটি চিনতে সহজ করে দেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা আমাদেরকে সবাইকে হক দল চেনার এবং শাহাদাত পর্যন্ত হকে দলের সাথে থেকে কিতাল করে যাওয়ার তাউফিক দান করুন। আমীন!

জিহাদের পথে ৮ টি বাধা

শাইখ ইউসুফ আল উয়াইরি (রহিমাহুল্লাহ) এবং অনুবাদ - বিলাল আব্দুল কারিম (বাঙ্গালী)

একজন মুজাহিদের অর্জিত সবচেয়ে বড় বিজয় হল তার নফসের বিরুদ্ধে এবং দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্কের বিরুদ্ধে। একজন মুজাহিদ এমন একটি ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করেন যেখানে প্রায় সমগ্র উম্মাহই ব্যর্থ। তা হচ্ছে ত্যাগ ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর ক্ষেত্রে। আল্লাহ আজ্জাওয়াজাল বলেন,

বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। (সূরা তাওবা, ২৪)

প্রিয় ভাইয়েরা এই আয়াতে একজন মুসলমান ও আল্লাহর পথে জিহাদের এর মধ্যে আটটি বাঁধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াত জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর পথে আটটি প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছে। এবং আরো যদি অন্যান্য বাধা থাকে তবে সেগুলোও এই আটটির সাথে সম্পর্কিত। এই আটটি প্রতিবন্ধকতা কী কী?

প্রথমত 'তোমাদের পিতা'। বিশেষ করে আমরা এমন একটি সময় আছি যখন এই উম্মাহ জানে না বা বোঝে না যে ইসলামের প্রতি তাদের কী করনীয়। এই উম্মাহ আল্লাহকে ভালবাসে রাসূল (সাঃ) কে ভালবাসে তারা প্রকৃত মুসলমান হতে চায়, তারা মুসলমান হিসেবে গর্ববোধ করে, কিন্তু তারা আসলে বুঝতে পারে না যে আল্লাহ তাদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন, তারা বুঝতে পারে না যে রাসূল (সাঃ) তাদের কি আদেশ করেছেন। বর্তমান সময়ে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ হচ্ছে ফরজে-আইন। কিন্তু এরকম পিতা মাতা খুজে পাওয়া খুবই দুষ্কর যারা তাদের সন্তানদের আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার অনুমতি দিবেন। তাই আল্লাহ বলেছেন তোমাদের পিতাগণ একটি বাধা, বর্তমানে ঠিক সেরকম পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। 'পিতাগণ' হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। উম্মাহর বেশিরভাগ পিতাই তাদের সন্তানদের আল্লাহর পথে জিহাদ করার অনুমতি দিবেন না।

এবং খাত্তাব (রহঃ) বলেছেন যে,

যদি আমরা আমাদের পিতার অবাধ্য না হতাম, আমরা কেউই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারতাম না। আমাদের পিতার অবাধ্য হতে হয়েছিল।

এ ক্ষেত্রে পিতামাতার অবাধ্য হওয়া একটি পুন্যের কাজ। গুরুত্বের দিক থেকে আল্লাহর পর পিতা মাতার আদেশ মান্য করার স্থান দ্বিতীয়তে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের অমান্য করা একটি পুন্যের কাজ কারণ আপনি আল্লাহর জন্য তাদের অমান্য করছেন। তাই, আপনি আপনার পিতা মাতার আদেশ মান্য করা করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ তাদের আদেশ আল্লাহর আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। যখনই তাদের আদেশ আল্লাহর আদেশের বিপরীতমুখী হবে তখন আপনি কোনটা বেছে নেবেন? আপনি আল্লাহর আদেশ মানবেন নাকি পিতামাতার? এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনাকে আল্লাহর আদেশই মানতে হবে। সব কিছুর উপর আল্লাহর আদেশ কে স্থান দিতে হবে।

সুতরাং কেউ যদি সাধারণভাবে পিতা-মাতার আনুগত্য করে থাকেন কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাদের অমান্য করেন তবে বুঝতে হবে তিনি সংস্কৃতির কারণে নয় বরং আল্লাহর জন্যই পিতা-মাতার আনুগত্য করেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে পিতা মাতার আনুগত্য করার সঠিক নিয়ত হয়েছে তার।

কারণ এমন অনেক লোক আছে যারা শুধু সংস্কৃতির কারণে পিতা-মাতার আনুগত্য করেন। আবার এমন অনেকে আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আনুগত্য করেন, তারা পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করেন শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। তাই, যখন আল্লাহ ও পিতা মাতার আদেশ সাংঘর্ষিক হয় তখন আল্লাহর আদেশ কে প্রাধান্য দেন। তো এটাই হচ্ছে প্রথম বাধা।

দ্বিতীয় 'তোমাদের সন্তান'। আপনাদের মধ্যে যারা বিবাহিত তারা বুঝবেন যে সন্তান কতখানি প্রিয় হতে পারে। হাদিসে বলা হয়েছে সন্তান তোমাদের কৃপণ ও কাপুরুষ এ পরিণত করে। যাদের সন্তান আছে তাদের এ দুটো রোগ দেখা দেয় তাবে তারা ব্যতীত যাদের উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে। কেন সন্তান একজন মানুষকে কাপুরুষে পরিণত করে? কারণ "আমাকে এখন পরিবার সামলাতে হয়। সন্তানদের কাপড় দিতে হয়। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়। আমাকে এটা করতে হয়, সেটা করতে হয়" তাই টাকা দেয়ার কথা আসলে তাদের হাত সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততির উপস্থিতি তাদের দ্বিতীয়বার ভাবতে বাধ্য করে।

তো, এরকম অনেক লোক আপনি পাবেন যাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন তারা কেন জিহাদে অংশগ্রহণ করে না, তারা বলবে আমার জিহাদ হচ্ছে পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করা। এটাই আমার জিহাদ। নিজেকে আল্লাহর পথের মুজাহিদ ভেবে সে নিজেকেই বোকা বানাচ্ছে। তার এবং আল্লাহর পথে জিহাদের মধ্যে তার সন্তান ও পরিবার একটি বড় বাধা। এটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত যে এই রোগটি এইসব ভাইদেরও হয় যারা আল্লাহর পথে জিহাদকে বোঝেন এবং এক সময় আল্লাহর পথে মুজাহিদ ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর যখন তাদের সন্তান হয়, হঠাৎই এগুলো তাদের পেছনে বসে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এটা এমন এক ফিৎনা যা তাদেরকে দুনিয়ার সাথে আঁকড়ে ধরে রাখে।

একজন এ কারণে একজন বিবাহিত পুরুষ, যার সন্তান আছে, একজন অবিবাহিত পুরুষের চেয়ে, যার এমন কোনো পিছুটান নেই, বেশি সওয়াব পাবেন। এবং সাহাবা (রাঃ) এর সময় ফিতনা ছিল পরিপূর্ন - তাদের অনেকেরই দুই তিন বা চার জন স্ত্রী ছিলেন, আপনার একটি বা দুটি সন্তান আছে আর তাদের অনেক সন্তান ছিল, অন্যদিকে পরিবারের পেছনে ব্যয় করার মত সম্পদ ছিল তাদের খুবই সীমিত। তাই তাদের ক্ষেত্রে ফিতনা ছিল একদম পরিপূর্ণ। এ কারণে তারা যখন আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা ছিল খুবই বড় একটি পদক্ষেপ। তো জিহাদের ক্ষেত্রে পরিবার হচ্ছে খুবই বড় একটি ফিতনাহ।

যখন রাসূল (সাঃ) হিজরত করলেন তা প্রথমদিকে ফরজে আইন ছিল, তা ছিল বাধ্যতামূলক। তো মক্কার অনেক মুসলিম হিজরত করতে চাইলেন। এই হিজরত ছিল খুবই বড় ত্যাগ। কারণ মক্কার কাফির-মুশরিকরা তাদের কোন সম্পদ সাথে নিতে দেয়নি। তারা মুসলিমদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। মুহাজিররা তাদের সাথে কোন সম্পদ নিয়ে যেতে পারেননি। নিজের ভূমি ছেড়ে তারা অচেনা ভূমিতে যাচ্ছিলেন যেখানে তাদের কোন অর্থনৈতিক সাহায্য ছিল না। এটা ছিল খুবই কঠিন এক পরিস্থিতি।

মক্কার কিছু মুসলিম হিজরত করতে চাইলেন। তখন তাদের সন্তান ও স্ত্রীগন তাদের কে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো, এখানে আমাদের কোন সাহায্যকারী নেই, আমাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। কার জন্য আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন? ফলে সেই মুসলমানদের মন গলে গেল এবং তারা মক্কায় থেকে গেলেন। কেন? পরিবার দেখাশোনা করার জন্য।

বেশ কয়েক বছর পর রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীগণ মক্কা বিজয় করে ফিরে এলেন। ওই মুসলিমগণ যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন তারা আল্লাহর মাত্র একটি আদেশ অমান্য করেছিলেন যে তারা হিজরত করেন নি। যার ফলাফল স্বরূপ তারা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর সাথে জিহাদ করতে পারেন নি, রাসূল (সাঃ) এর হালাকায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, মসজিদে নববীতে রাসূল (সাঃ) এর খুতবা শুনতে পারেন নি, রাসূল (সাঃ) এর তালবিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন নি এবং মদীনার ইসলামী সমাজে বসবাস করতে পারেন নি। তারা এত সব থেকে বঞ্চিত হলেন শুধুমাত্র একটি আদেশ অমান্য করার কারণে।

ইবনুল কাইয়ুম (রঃ) বলেন পাপ ও পুণ্য কাজ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তারা তারা মাত্র একটি পাপ করেছিলেন যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে তারা অনেক পণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

এই উদাহরণটি দিকে লক্ষ্য করুন - নামাজের সময় হয়েছে এবং আপনি বাড়িতে বসে আছেন। আপনি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এটা হচ্ছে একটি পূর্ণ কাজ। আপনি বাড়ি থেকে বের হয়ে মসজিদে যাচ্ছেন, প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব পাচ্ছেন; মুসল্লিদের সালাম দেয়ার কারণে সালামের সওয়াব পাচ্ছেন; তাদের সাথে মুসাফা করার সময় আপনার পাপ ঝরে পড়ছে; তারপর জামাআতে নামাজ আদায় করার জন্য সে সওয়াব পেলেন; তারপর জিকির করলেন এবং জিকিরের সওয়াব পেলেন; তারপর সুন্নত নামাজ আদায় করলেন এবং সে সওয়াব পেলেন এবং সব শেষে বাড়ি ফেরার সময়ও প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব পেলেন। খেয়াল করুন কিভাবে একটি পূর্ণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। আবার আপনি যদি বাড়িতে বসে থাকতেন তাহলে এই সমস্ত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতেন।

অন্যদিকে পাপ কাজও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যেমন - একজন মদ খাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল, মাতাল হল, কাউকে হত্যা করল, বা যিনাহ করে ফেলল বা অন্য কোনো পাপ কাজ করল। এখানেও পাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি সে মদ না খেত তাহলে তার হয়তো এতগুলো পাপ করা হতো না। তাই পাপ ও পুণ্য কাজ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

এখন যখন রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীরা ফিরে আসলেন, মক্কার ঐ মুসলিমগণ দেখলেন যে মুহাজির সাহাবীরা (রাঃ) রাসুল (সাঃ) এর সাথে এই বছরগুলো থাকার কারণে অনেক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। তারা বদর, ওহুদ, আল খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, রাসুল (সাঃ) এর সান্নিধ্যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, পুরো কুরআন মুখস্ত করেছেন, অন্যদিকে মক্কার মুসলিমগন এতসব পূণ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

পরিবারের কারণে এত পূণ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে মক্কার মুসলিমগন খুবই হতাশ হলেন। তখন আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন, তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের থেকে সাবধান থাক। যাদেরকে তোমরা তোমাদের মিত্র ভাবছ, দুনিয়াতে সবচেয়ে কাছের মানুষ ভাবছ, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানরা, আল্লাহ বলেছেন তারা তোমাদের শত্রুও হতে পারে।

তখন ওই মুসলিমগণ ক্ষুব্ধ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের প্রহার করতে লাগলেন, দেখ তোমাদের জন্য আমরা কত পূর্ণ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আল্লাহ তখন এই আয়াতের বাকি অংশ নাযিল করলেন, যদি তোমরা ক্ষমাশীল হও, আল্লাহকেও ক্ষমাশীল ও দয়াবান পাবে। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাদেরকে প্রহার করা কোন কাজেই আসবে না। তাই আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের একটি পথই খোলা আছে তা হল ক্ষমার পথ। তোমরা ঐ সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং এখন আর কিছু করার নেই।

তাই, আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে, বিশেষ করে ঐসব ভাইদের যারা জিহাদ এবং বর্তমানে জিহাদ এর প্রয়োজনীয়তা বুঝেন এবং তারা হয়ত একসময় মুজাহিদ ছিলেন। তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে জিহাদের তুলনায় পরিবারের গুরুত্ব কতখানি যখন জিহাদ ফরজে-আইন। তাই জিহাদকে পরিবার ও সন্তান সহ সকল কিছুর উপর প্রাধান্য দিতে হবে তো এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বাধা।

তৃতীয়ত "তোমাদের ভাইগণ"। ভাইরাও জিহাদের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তারা আপনাকে সহযোগিতা করবে না। আপনি জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য পরিবার বা ব্যবসা যেটাই পেছনে রেখে যাবেন তারা তার দেখভাল করবে না।

এরপর আসছে "তোমাদের গোত্র"। বর্তমানে আমরা বলি জাতি, মাতৃভূমি, দেশ এবং জাতীয়তাবাদ একটি প্রতিবন্ধকতা।

লোকদের দেখবেন আল্লাহর পথে জিহাদ এর চেয়ে তারা জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। তারা বলে দেশে শান্তি বজায় রাখা দরকার এবং দেশকে বিপদমুক্ত রাখার প্রয়োজন। কেন? কারণ এটা দেশের জাতীয় বা গণস্বার্থ। তারা বুঝে না যে আমাদের উচিত আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থ দেখা, দেশের স্বার্থ নয়।

আমাদের উচিত জাতিগত পরিচয় ভুলে আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করা। অনেক ভাইরা এবং অনেক সংগঠন জিহাদ থেকে দূরে থাকে "জাতিকে বিপদমুক্ত" রাখার অজুহাতে। আর এটা মানুষ জিহাদের মধ্যে একটি বাধা। যেমন ধরুন, কিছু কিছু মুসলিম দেশ বলে যে আমাদের এখানে জিহাদের প্রয়োজন নেই কারন জিহাদ করলে কাফিররা আমাদের দেশ আক্রমন করবে, দখল করবে।

আল্লাহর পথে জিহাদ না করার পেছনে এটা কোন যুক্তিই হতে পারে না। আল্লাহ যা চান আপনাকে তাই করতে হবে, আর ফলাফল আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। যদি আল্লাহর নির্ধারিত করে থাকেন যে আল্লাহর শত্রুরা আপনাদের দেশ আক্রমণ করে দখল করবে, তাহলে সেটা তো আল্লাহরই কদর।

আপনি তাই করবেন যা আল্লাহ আপনাকে করতে বলেছেন। এই মহাবিশ্ব পরিচালনা আপনি করছেন না বরং আল্লাহই পরিচালনা করছেন সুতরাং ফলাফল আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন। আল্লাহ আমাদের জিহাদ করতে বলেছেন এবং আমরা ইবাদত হিসেবে করব।

অনেক মুসলিম আছে যারা জাতীয়তাবাদের জন্য, দেশের জন্য যুদ্ধ করেন, কিন্তু আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করেন না। তারা মুসলিমদের সম্মানের জন্য যুদ্ধ করেন না, তারা আল্লাহর দ্বীনের সম্মানের জন্য যুদ্ধ করেন না। তারা জানতে পারেন যে কোরআন কে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে, মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু তারা সে ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেন না।

কিন্তু তাদের রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা যদি বলেন যে চলো আমরা ঐ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি তাহলে তারা যুদ্ধে যাবার জন্য তৈরি হয়ে যাবে, যদি তাদের প্রতিপক্ষ একটি মুসলিম দেশও হয়। তারা জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করবে কিন্তু ইসলামের জন্য নয়।

পরবর্তী বাধা হচ্ছে 'তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ এবং তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর"। এ দুটি আলাদা হলেও একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্জিত সম্পদ, টাকা, স্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসা এবং ব্যবসার আশু লাভ আল্লাহর পথে জিহাদ ও মুসলমানদের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু লোক তাদের দোকানের কারণে, কিছু লোক তাদের রেস্তোরাঁর কারণে এবং কিছু লোক এই কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করো না যে তারা কোন অফিসের কর্মচারী। অথচ আল্লাহ এগুলোকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

ভাই ও বোনেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করার জন্য কারণ খোঁজেন। তাঁরা বলেন দাওয়াহই জিহাদ, আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি আল্লাহর দ্বীনের জন্য কাজ করছি, আমি একজন শিক্ষক, আমি একজন ডাক্তার। কিন্তু জিহাদ যদি ফরজে আইন হয় তবে আপনাকে তা করতেই হবে। হ্যাঁ, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে উম্মাহর জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক এবং সকল পেশাজীবী প্রয়োজন, কিন্তু আপনি কি বলতে পারেন যে আমি একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তাই আমি নামাজ পড়বো না এবং রোজা রাখব না? কেউ কি এমন বলে? তাহলে, জিহাদ ও নামাজের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে নামাজ ও রোজার মতই বাধ্যতামূলক।

আল্লাহ বলেছেন 'তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় কর'। আনসাররা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বাইয়াত দিলেন যে তারা নিজেদের পরিবারকে যেভাবে রক্ষা করেন ঠিক সেভাবেই রাসূল (সাঃ) কে রক্ষা করবেন, তা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শপথ। কারণ রাসুল (সাঃ) তাদেরকে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, এক যুদ্ধ থেকে আরেক যুদ্ধে, নিয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তারা ঠিক ভাবে তাদের কৃষিকাজের খেয়াল রাখতে পারছিলেন না। আপনারা জানেন কৃষিকাজ সপ্তাহে পাঁচদিন অফিসের মত করার কাজ নয়, বরং তার জন্য নিবিড় ও নিয়মিত পরিচর্যার প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে আপনি বলতে পারবেন না যে আমার ছুটি দরকার, আমি সপ্তাহে পাঁচদিন গাছের যত্ন নিব এবং গ্রীষ্মে আমাকে ছুটি দিতে হবে। আপনাকে নিবিড় পরিচর্যা করতে হবে। আনসারদের আয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল কারণ তারা কৃষি কাজে সময় দিতে পারছিলেন না।

তাই যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা মুক্ত করলেন, আনসাররা ভাবলেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আমাদের কাজ শেষ করেছি, রাসূল (সাঃ) কে সাহায্য করেছি এবং তার মাতৃভূমি এখন মুক্ত। এখন আমরা ফিরে যেতে পারি এবং আমাদের কৃষি কাজে মনোযোগ দিতে পারি। আমাদের যা করা দরকার ছিল আমরা করেছি এখন আমরা ফিরে গিয়ে আমাদের ব্যবসার দিকে নজর দিতে পারব।

আল্লাহ তখন আয়াত নাযিল করলেন,

তোমাদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আনসারদের কৃষিকাজে ফিরে যাওয়াকে আল্লাহ ধ্বংসের কাজ বলেন যদিও তখন তাদের জন্য জিহাদ ফরজে আইন ছিল না তখন ছিল ফরজে কিফায়া। তা ব্যক্তিগত ফরজ ছিল না বরং তা ছিল সমষ্টিগত ফরজ। অর্থাৎ কিছু লোক পালন করলেই সবার আদায় হয়ে যাবে।

আবু আইয়ুব বলেন, এই আয়াতটি তাদের জন্য নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে আমরা যদি কৃষিকাজে ফিরে যাই তাহলে তা হবে নিজেদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়া।

তাই যেসব মুসলিমরা এখন চাকরি নিয়ে, তাদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত, তাদের এই আয়াত শুনিয়ে দিন যে তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যখন তারা কাজ ও জীবিকার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদকে ত্যাগ করেছে।

সবশেষে 'তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর'। ঘরের আরবি শব্দ হচ্ছে মিসকান যা এসেছে সাকিনা বা প্রশান্তি থেকে। আপনি যখন বাড়িতে থাকবেন তখন প্রশান্তি অনুভব করবেন কারণ ঘর হচ্ছে শান্তির নিদর্শন।

আমরা প্রকৃতিগত ভাবেই আমাদের বাসস্থান বসবাসের প্রতি আসক্ত, বিশেষ করে আমাদের ঘরের প্রতি। আমাদের মাতৃভূমিও এর আওতায় পড়ে। আপনি ঘরের প্রতি টান অনুভব করবেন কারন আমরা আমাদের বাড়িতে একটি নির্দিষ্ট রুটিন এ অভ্যস্ত হয়ে যাই - যে খাবার খাই, যে বিছানায় ঘুমাই। যখন কোন কিছু আপনার এই রুটিনকে ব্যাহত করে তখন আপনি অনিরাপদ বোধ করেন যা প্রশান্তির বিপরীত। বাড়িতে থাকলে আপনি প্রশান্তি অনুভব করেন এবং আপনার রুটিন যদি ব্যাহত হয় তবে আপনি অনিরাপদ বোধ করেন।

একজন মুজাহিদ এই রুটিন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যান। যে খাবার খান তা তার মা বা স্ত্রীর রান্না করা খাবার থেকে ভিন্ন, যে বিছানায় ঘুমান তা তেমন আরামদায়ক নয়, আবহাওয়া ভিন্ন হতে পারে এবং ঘুমানোর সময় পাল্টে যেতে পারে। এসব আপনাকে বাড়ি ফিরে যেতে ব্যাকুল করে তোলে। যখন একজন আরব মুজাহিদ কাশ্মীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন তার কাছে সেখানকার খাবার খুব ঝাঁঝালো মনে হয়। আবার একজন পাকিস্তানি মুজাহিদ যখনই ইরাক বা অন্য কোথাও জিহাদে অংশগ্রহণ করেন তখন তার কাছে খাবার খুব নমনীয় মনে হয়, রুটিন পাল্টে যায়, তাপমাত্রাও পাল্টে যায়।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের (রাঃ) কথা যদি চিন্তা করি তখন তিনি আরমেনিয়াতে জিহাদ করেছিলেন, যদিও এ ব্যাপারটি আরো অনেক সাহাবার (রাঃ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি আরবে বড় হয়েছেন যেখানে আবহাওয়া খুবই গরম, অথচ তিনি যুদ্ধ করছিলেন এমন এক জায়গায় যা কয়েক ফিট তুষারে ঢাকা থাকে। এই ধরনের রুটিন পরিবর্তন মেনে নেয়া কিন্তু সহজ নয় - এটা খুব বড় একটা ত্যাগ।

সম্ভবত এ কারণেই হজ্ব জিহাদের সাথে সম্পর্কিত। কিছু কিছু হাদিস আপনি দেখবেন যে জিহাদ ও হজের কথা এক হাদীসে এসেছে। যেমন - যখন আয়েশা (রাঃ) রাসুল (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে পুরুষরা আপনার সাথে জামাতে নামাজ পড়ে, আপনার সাথে জুম্মার নামাজ পড়ে, আপনার সাথে জিহাদে যোগদান করে, মহিলাদের ব্যাপারে কি হবে? রাসূল (সাঃ) বললেন আপনাদের জিহাদ হচ্ছে হজ্ব।

কারণ একটু নিচের স্তরের হলেও হজ্বের সাথে জিহাদের কিছুটা সামঞ্জস্য আছে। হজ্বের জন্য আপনাকে ভ্রমণ করতে হয়, জিহাদেও অনেক ক্ষেত্রে ভ্রমণ করতে হয়। হজ্বে আপনার রুটিন পরিবর্তন হয়। যেমন - হজ্বের সময় ভিন্ন পোশাক পরিধান করতে হয়, তারপর আপনি হজ্ব চলাকালীন সময় নখ ও চুল কাটতে পারবেন না, সেখানকার খাবার ভিন্ন, মিনা ও আরাফায় ঘুমানোর অবস্থা তেমন আরামদায়ক নয়, এরকমভাবে আপনার রুটিন পাল্টে যায়। আপনাকে অনেক টাকাও খরচ করতে হয় কারণ হজ্ব বেশ ব্যয়বহুল। সুতরাং হজ্ব ও জিহাদের মধ্যে কিছুটা মিল রয়েছে যদিও জিহাদের ত্যাগ অনেক বড় মাপের ত্যাগ।

যদি আপনার বাসস্থানের প্রতি আপনার ভালোবাসা আপনাকে আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে দূরে রাখে, তাহলে তা প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়। তাবুক যুদ্ধের কথা যদি বলি, তাবুক প্রান্তরে যাওয়ার জন্য অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল, তখন উত্তপ্ত গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরম, ফসল ঘরে তোলার সময় তখন। সবাই তখন ফসল ঘরে তোলার পরিকল্পনা করছিলেন রাসূল (সাঃ) তাদের বললেন যে আমাদের এখন রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সুতরাং তা ছিল খুবই বড় একটি ত্যাগ।

সেসময় একজন সাহাবী (রাঃ) তার ঘরে গিয়ে দেখলেন যে তার স্ত্রী বাড়ির উঠান পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে যাতে গরম কম লাগে। তখন তিনি তার আরেক ঘরে গিয়ে দেখলেন তার দ্বিতীয় স্ত্রীও একই কাজ করেছে। ঘরের প্রতি টান তাকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বিরত রাখল। যে তিনজন তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তিনি তাদের মধ্যে একজন যিনি ঘরের টানে যুদ্ধে যান নি।

যাদের এমন রুটিন পরিবর্তনের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে তারা জানেন যে এ বিষয়টি এক সময় না এক সময় ঘরের প্রতি দুর্বল করে তুলবে। কোন কোন মুজাহিদ বাড়ি না ফিরে, তাদের পরিবারের কাছে ফিরে না গিয়ে বছরের পর বছর যুদ্ধের ময়দান কাটিয়ে দেন। এতে যখন ধৈর্যের প্রয়োজন। অতএব একজন মুজাহিদের অন্যতম একটি গুন হচ্ছে সবর।

এই আয়াতের পর আল্লাহ বলেছেন, বল, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ, তার রাসূল ও তার রাঁহে জিহাদ করার থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর চূড়ান্ত নির্দেশ বা আল্লাহর শাস্তি আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে, অবাধ্য আচরণকারীদের, আদেশ অমান্যকারীদের হিদায়াত করেন না।

যখন একজন মুজাহিদ এই আটটি প্রতিবন্ধতার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে, তা একটি অসাধারণ বিজয়। এর সাথে তিনি আরেকটি বিজয় লাভ করেন, তা হচ্ছে ফাসিক না হওয়া। কারণ আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ তাদের হেদায়েত করেন না। ফাসিকের কাতারে না পড়া একটি বিশাল বিজয় নয়? আল্লাহ, তার রাসূল (সাঃ) ও জিহাদের প্রতি ভালোবাসা আক্ষরিক অর্থে প্রমাণের মাধ্যমে আপনি এই বিজয় অর্জন করেছেন। এখন আর এটা কোন মুখের কথা নয়। আর যদি আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) ও জিহাদের চেয়ে এই আটটির কোন একটিকে বেশি ভালবাসেন তবে আপনি ফাসিক হয়ে গেলেন এবং আল্লাহর শাস্তি আপনার উপর অনিবার্য।

সুতরাং যারা দাবি করে যে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কে ভালোবাসেন তাদের তা প্রমাণ করতে হবে। এবং তাদেরকে সেটা কথা নয়, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। একজন মুজাহিদ হওয়ার মাধ্যমেই আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন। আপনি দেখবেন যে অনেক সংগঠন ও অনেক মুসলমান আছে যারা জোর গলায় বলে যে শুধু তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (সাঃ) ভালোবাসার পথে দেখাতে পারে, তারাই আল্লাহ রাসুল (সাঃ) কে ভালোবাসে। তারা আরো বলে যে দেখুন আমরা রাসূল (সাঃ) এর কত প্রশংসা করি তাকে ঘিরে আমাদের কত উদযাপন। এগুলো শুধুই মুখের বুলি।

যদি আপনি দেখাতে চান যে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) - কে ভালোবাসেন তাহলে মুজাহিদের কাতারে যোগ দিন, তাহলে আপনাকে আর এই বিষয়ে কিছু বলতে হবে না কারণ আপনি তা কাজের মাধ্যমেই প্রমাণ করছেন। ইসলাম শুধু মুখের কথার ধর্ম নয়, এটা কাজের ধর্ম। আপনার বিশ্বাস আপনার কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে।

জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি শর্ত কিনা?

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে,

“একব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে জিহাদে বের হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাকে বললেন তোমার পিতামাতা কি বেঁচে আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তাদের নিকট জিহাদ করো।”

অন্য একটি হাদীসে এসেছে “রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি প্রথমে বললেন সময় মতো নামাজ আদায় করা, পরে বললেন পিতা-মাতার সাথে ভাল আচরণ করা তারপর বললেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস দুটির মাধ্যমে অনেকে বিভিন্নরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকেন এবং সর্বাবস্থায় জিহাদে যাওয়ার জন্য বাবা-মার অনুমতি জরুরী মনে করেন। আমরা অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে লিখেছিঃ সাধারন অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া কিন্তু বিশেষ কিছু অবস্থায় ফরজে আইন হয়ে যায়। জিহাদ যখন ফরজে কিফায়া থাকে এবং যথেষ্ট সংখক মুসলিম জিহাদে অংশগ্রহন করে তবে বাকীদের উপর জিহাদে অংশগ্রহন করা বাধ্যতামুলক থাকেনা তারা ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণ করে গনীমত ও সূউচ্চ মর্যাদা হাসীল করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে অংশগ্রহণ নাও করতে পারে। এই অবস্থায় পিতামাতার অনুমতি ছাড়া জিহাদ করা বৈধ নয়। কিন্তু জিহাদ যখন ফরজে আইন হয়ে যায় বা যথেষ্ট সংখক মুজাহিদ জিহাদে যোগদান না করেন, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। তখন পিতা মাতার অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই যেভাবে নামাজ, রোযার জন্য পিতামাতার অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

ইবনে হাযার আসকালানী (রঃ) বলেন, জমহুর আলেম বলেছেন পিতামাতা যদি মুসলমান হয় তবে তারা নিষেধ করলে জিহাদ করা বৈধ হবে না কেননা পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা ফরজে আইন আর জিহাদ ফরজে কিফায়া। তবে যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন কোনো অনুমতির প্রয়োজন নেই। (ফাতহুল বারী)
পরবর্তী হাদীসে যে জিহাদকে পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহারের পরে উল্লেখ করা হয়েছে এটাও ঐ অবস্থায় যখন জিহাদ ফরজে কিফায়া থাকে কিন্তু যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায় তখন পিতামাতার খেদমতের চেয়ে জিহাদ করা অধিক ফজীলতের আমল হবে। এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যেমনঃ

"একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল হে আল্লাহর রসুল আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যার মাধ্যমে আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুজাহিদদের সমান পুরুষ্কার পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি কি (মুজাহিদ ফিরে না আসা পর্যন্ত) অনবরত ক্লানি-হীনভাবে নামাজ আদায় করতে ও কোনোরুপ পানাহার ব্যতিরেখেই রোযা রাখতে সক্ষম? উক্ত ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসুল, কে এই কাজ করতে সক্ষম? (সহীহ বুখারী)

আর যদি আমরা মেনেও নিই যে পিতামাতার সাথে ভাল আচরন করা জিহাদের চেয়ে উত্তম তবে এর অর্থ কি এই যে পিতামাতার সাথে ভাল আচরণ করলেই জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে? একই হাদীসে তো নামাজকে পিতামাতার সাথে ভাল আচরণের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ কি এ যে যেহেতু নামাজ পিতামাতার সাথে ভাল আচরণের তুলনায় উত্তম আমল তাই একজন মুসল্লির জন্য পিতামাতার খেদমতের প্রয়োজন নেই? একটি কাজ অন্য একটি কাজ থেকে উত্তম হলেই অন্য কাজটির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। বরং মুক্তি পেতে হলে প্রতিটি ফরজ দায়িত্বই নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হবে।

পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ই'দাদ গ্রহণের বিধান

তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। সূরা আত-তাওবাহ্, আয়াত: ২৪।

কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের এ যামানায় জিহাদের জন্য ই'দাদ গ্রহণ করা ফরযে আইন। বিশেষত বর্তমান সময়ে যখন জিহাদ ফরযে আইন হয়ে গেছে। কাজেই পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ই'দাদ গ্রহণে কোন সমস্যা নেই। বিশেষত যখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, আপনার পিতা কিছুতেই আপনার জন্য এর অনুমতি দেবে না। আপনার পিতার জন্য আপনাকে এ ফরয আঞ্জাম দেয়া থেকে বারণ করা জায়েয নয়। তিনি নামায-রোযায় আপনাকে যেমন উদ্বুদ্ধ করেন, ই'দাদ ও জিহাদেও

তেমনি উদ্বুদ্ধ করবেন- এটাই ছিল স্বাভাবিক। আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে কোন বান্দার আনুগত্য বৈধ নয়। কাজেই আপনি আপনার এ কাজের দ্বারা নাফরমান হচ্ছেন না। বরং আল্লাহ তাআলা যে ফরয আপনার উপর ধার্য করেছেন, তা আঞ্জাম দেয়া থেকে বারণ করার দ্বারা তিনি নিজেই নাফরমান হচ্ছেন। যদি আপনার পিতার দিক থেকের ক্ষতি এড়িয়ে আপনি ই'দাদ গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে তাই করুন। আর যদি নিজের ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কায় থাকেন, তাহলে ক্ষতি এড়িয়েও ই'দাদ গ্রহণ করার মতো অনেক উপায় আছে। আপনি সেগুলো অবলম্বন করুন। আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য চান। দুর্বল হয়ে পড়বেন না। (শায়খ আবু উসামা আশশামী, সদস্য: মিম্বারুত তাওহিদ ২২/১০/২০০৯)

ইবনে নুহহাস (রাহ:) বলেন, জিহাদ ফরজে আইন হওয়ায় গোলাম তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতীত জিহাদে বের হয়ে যাবে। সমস্ত যুদ্ধ উপযুক্ত ব্যাক্তি তার পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত ঋণী ব্যাক্তি তার ঋণদাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে চলে যাবে।

এ সকল বিধান বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রাহ:) এর অভিমত।

প্রস্তুতি গ্রহণ

সময় হাতে বেশি বাকি নেই, প্রস্তুতি গ্রহণের এখনই সময়। বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মুসলিম দেশে যে পরিস্থিতি চলছে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও কুফরের সংঘাত সামগ্রিক বিচারে ক্রমশ যে তীব্রতা ধারণ করছে, সর্বোপরি এত স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি যে হারে বদলে যাচ্ছে সেসব কিছুর আলোকে আমি অনেকটা নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাদের আর বেশি সময় বাকি নেই। যেকোন সময়, যেকোন মুহূর্তে দেশে বড় ধরনের কিছু একটা ঘটে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে যেন কেবল। এবং কিছু একটা শুরু হয়ে গেলে দেশের মানুষ আক্রান্ত অন্যান্য মুসলিম দেশগুলির মত স্বাভাবিক চার ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।

প্রথম ভাগ: যারা উচ্চবিত্ত, বিলাসী প্রকৃতির, সমাজের এলিট শ্রেণীর লোকজন, বিভিন্ন দেশের সাথে যাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক যোগসাজশ আছে তারা নিশ্চিন্তে সোজা ওইসব দেশে গিয়ে ঠাঁই নেবে।
দ্বিতীয় ভাগ: যারা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সাধারণ শ্রেণীর লোকজন, দ্বীনধর্মের সাথে যাদের বিশেষ একটা সম্পর্ক নেই, মানে যারা জিহাদ-কিতালের ব্যাপারে, কাফেরদের প্রতিরোধের ব্যাপারে মানসিকভাবে প্রস্তুত না (সংঘাতটা যেহেতু ইসলামী ইস্যুতে হবে। জাতীয়তাবাদ বা অন্যকোন ইস্যু না) তো এরা দলে দলে, লাখে লাখে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিবে।
তৃতীয় ভাগ: উপরোল্লিখিত উভয় শ্রেণীর অনেকেই পার্থিব স্বার্থ রক্ষায় শত্রুপক্ষের দালাল হয়ে কাজ করবে। এদের মধ্যে অনেক আলেম উলামাও থাকবে।
চতুর্থ ভাগ: দ্বীনধর্মের সাথে যাদের সম্পর্ক ভাল। এক কথায় যারা প্র্যাকটিসিং মুসলিম, সেইসাথে আগ থেকেই শারীরিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিকভাবে না হলেও অন্ততঃ মানসিকভাবে যারা জিহাদের ব্যাপারে প্রস্তুত ছিলেন তারা এবং একমাত্র তারাই আগ্রাসী শত্রুর মুকাবেলায় জীবন-মরণ প্রতিরোধ চালিয়ে যাবেন। তারাই কেবল ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন। অন্য কেউ নয়।

এখন প্রত্যেকে নিজের অবস্থার দিকে গভীর মনযোগ দেয়া জরুরি যে, সেই পরিস্থিতিতে আমি উল্লেখিত চার শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবো?
এজন্য এখন থেকেই যদি নিজেকে সেই কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুত করে না তুলি, সেই রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আগাম প্রস্তুতি না নেই তাহলে সেইসময় কাজের কাজ কিছু করতে পারা দূরে থাক, ময়দানে থেকে গেলেও 'কাজের মানুষদের' জন্য কেবলই বোঝা হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবেনা।

তো, অন্ততঃ কাজের সময় 'কাজের মানুষদের' বোঝা না হয়ে সহযোগিতামূলক যেন কিছু করতে পারি, তাদের 'আনসার' এর ভূমিকায় থাকতে পারি সেই বিষয়ে বাস্তবসম্মত জরুরী দিকনির্দেশনা মূলক কিছু আলোচনা করার ইচ্ছা করছি। আল্লাহই উত্তম তাকফীকদাতা।

১। প্রথমতঃ জিহাদ বিষয়ে নিজের মনে উঁকি দেয়া অথবা অন্যের পক্ষ থেকে আরোপিত যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়, অভিযোগ-আপত্তি, বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা দূর করা আবশ্যক। অন্যাথায় জিহাদ শুরু হয়ে যাওয়ার পর যখন দেখা যাবে, একদল দরবারী আলেম তাগুত-কাফেরের তোষামোদি ও দালালী করার বিনিময়ে পার্থিব বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও আরাম-আয়েশ ভোগ করছে তখন নিজের অবস্থান নড়বড় হয়ে যেতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার বিকল্প নেই। পড়তে হবে- জিহাদ বিষয়ক কুরআনের আয়াত সমূহের তরজমা ও তাফসীর নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীরের আলোকে, এ বিষয়ক হাদীস সমূহ ও তার ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবাদী ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে। এ বিষয়ক ফিক্বহী মাসায়েল মুজতাহিদীন ফুক্বাহায়ে কেরামের ফিক্বহ ও ফতওয়ার আলোকে। এবং সেইসাথে সমকালীন মুজাহিদীন উলামা ও উমারার রচিত রাসায়েল (পুস্তিকা) ও মাক্বালাত (প্রবন্ধ-নিবন্ধ) অধ্যয়ন করতে হবে।
২। এখন থেকেই নিয়মিত বিশ্বব্যাপী চলমান জিহাদে মুজাহিদীনের খোঁজ খবর রাখুন।
৩। প্রতিদিন সকালে কমপক্ষে পঞ্চাশটি বুক ডন দিন। (বুক ডন দেয়ার সময় দৃষ্টি সামনের দিকে রাখুন) পেটের ভূরি / মেদ একেবারে কমিয়ে আনুন। ফজরের পরের ঘুম একেবারে বর্জন করুন।
৪। যেকোন রকম খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠার চেষ্টা করুন। যেমন, দেশি-বিদেশি, মশলাসহ, মশলা ছাড়া।
৫। বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ অন্যান্য সকল প্রকারের প্রযুক্তিগত সুযোগসুবিধা ছাড়া চলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। যেমন, প্রচণ্ড গরমে ফ্যান ছাড়া, রাতে বৈদ্যুতিক লাইট ছাড়া, সফরে মোবাইল ছাড়া চলার চেষ্টা করুন।
৬। গরমের দিনে লাগাতার কয়েকদিন গোসল ছাড়া ও শীতের দিনে প্রতিদিন সকালে গোসল করার অভ্যাস করুন। এভাবে প্রচণ্ড শীতের রাতে মাত্র একটা মাফলার বা রুমাল এবং হালকা পাতলা একটি কম্বল জড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়ার অভ্যাস করুন। খাবার ও গোসলের জন্য স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানি ছাড়াও চলার অভ্যাস করুন।
৭। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রিক্সায় / অটোতে চড়বেন না। যেমন, ২০/৩০ টাকা রিক্সা ভাড়ার পথ নিয়মিত হেটে চলার অভ্যাস করুন। বর্ণিত আছে, মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. ত্রিশ কিলোমিটারের চেয়ে কম দীর্ঘ পথে কখনো যানবাহনে চড়তেন না। তাঁরাই ছিলেন আমাদের প্রকৃত পূর্বসূরি।
৮। ঘরকুনো স্বভাব বর্জন করুন। যেকোন সময়, যেকোন মুহূর্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য দূর থেকে দূর গন্তব্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফরের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার অভ্যাস করুন। যেমন, সফরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাত্র আধা ঘন্টা বা তার চেয়ে কম সময়ে প্রস্তুতি নিয়ে পাঁচ-ছয় শ' বা সাতশো কিলোমিটার দূরের সফরে বেরিয়ে পড়ুন।
৯। পনেরো / বিশ কেজি সামানা কাঁধে বহন করে দীর্ঘ পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। (তাবলিগের চিল্লা এক্ষেত্রে খুব সহায়ক।)
১০। গভীর রাতে বনজঙ্গল বা পাহাড়ি এলাকায় দুয়েকজন মিলে বা একাকি চলার সাহস অর্জন করুন।
১১। ড্রাইভিং শিখুন। বিশেষত, মোটরসাইকেল চালানো শিখুন। অন্তত ৭০/৮০ কি.মি. বেগে চালানোর অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।
১২। সাঁতার শিখুন। বিশেষত, ডুব সাঁতার এবং খরস্রোতা নদীতে এবং প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাঝে সাঁতার কাটা শিখুন।
১৩। গাছে চড়া, পাহাড়ে চড়া শিখুন। পাহাড়ে উঠানামার জন্য সাধারণ পর্যটকদের পথ (যথা, ইকোপার্ক বা পাহাড় কাটা সিঁড়ি) বাদ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে লত বেয়ে উঠানামা করা শিখুন। এভাবে সিঁড়ি ছাড়া (জানালার সানসেট ও ভেন্টিলেটর দিয়ে) বিল্ডিং থেকে নেমে যাওয়া শিখুন।
১৪। ঘোড়ায় চড়া এবং ঘোড়দৌড় শিখুন।
১৫। নিশানা তাক করা শিখুন। প্রথমে হাতে, তারপর গুলাইল দিয়ে অতঃপর পাখি শিকার করার এয়ারগান দিয়ে।
১৬। কুংফু, ক্যারাতে শিখুন।
১৭। রান্নাবান্না করা শিখুন।

১৮। প্রয়োজনীয় সেলাইর কাজ শিখুন।
১৯। জরুরি দাতব্য চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করা শিখুন।
২০। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের বেসিক প্রোগ্রামগুলি শিখুন। যেমন, কম্পোজ করা, প্রিন্ট দেয়া, ওয়েব ব্রাউজিং, ডাউনলোড, বিভিন্ন ফাইল আপলোড এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের জেনারেল সিকিউরিটি সিস্টেমগুলো শিখুন।
২১। প্রতি মাসে উপার্জিত আয়ের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার অভ্যাস করুন।
২২। বালিশ ছাড়া, বিছানা ছাড়া খালি ফ্লোরে বা সরাসরি মাটির উপর ঘুমানোর অভ্যাস করুন। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক্ব দান করুন আমিন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি নিজে গাযওয়াতে (যুদ্ধের জন্য বের হওয়া) যায়নি কিংবা গাযওয়াতে যাবার ইচ্ছা পোষণ করেনি, সে নিফাকের একটি শাখার উপর মৃত্যু বরণ করলো। (সহীহ মুসলিম)

আল্লাম সিন্দী (রঃ) সুনান নাসায়ীর হাশিয়াতে বলেন, ‘এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সে জিহাদের যাবার নিয়্যত করে নি। আর জিহাদে যাবার নিয়্যত থাকার প্রমাণ হলোঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

আল্লাহ বলেছেনঃ

আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। (সূরা আত তাওবা, আয়াতঃ ৪৬)

জিহাদ যেমন ফরজ, তার প্রশিক্ষণও ফরজ, নামায যেমন ফরজ, শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করাও ফরজ। কাজেই প্রশিক্ষণ ছাড়া জিহাদ করার স্বপ্ন দেখা সব অবান্তর। একজন মুজাহিদ অনেক বিষয়ে পারদর্শী হওয়া লাগে। আমাদের কিন্তু লোক কম আমাদের শত্রু দের তুলনায়। তাদের প্রত্যেক গ্রুপের জন্য আলাদা আলাদা লোক আছে, তাদের বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার আছে। আমাদের আছে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও আস্থা। আমাদের শক্তি ঈমান ও তাকওয়া। আর মুমিনরা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে না, মুমিনরা ঈমান ও তাকওয়া দিয়ে যুদ্ধ করে। আর প্রশিক্ষণ ঈমান ও তাকওয়ার একটি অংশ। তাই আসুন আমরা একটু মুজাকারা করে নেয় প্রশিক্ষণের ব্যাপারে।

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়

দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণী যখন আরও একটু বাঁচতে চায়, জীবনকে আরো একটু উপভোগ করে নিতে চায় তখন আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যারা রাতের গভীরতার সাথে সাথে চোখের পানি ফেলে আল্লাহকে ডাকতে থাকে আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকে কখন সে নিজেকে আল্লাহর জন্য কুরবান করে দিতে পারবে।

তুমি তাকিয়ে দেখ সারা দুনিয়া আজ কত পঙ্কিলতায় ব্যস্ত। তাকিয়ে দেখ দুনিয়ার দিকে তুমি কি দেখতে পাও? নোংরামি, অসভ্যতা, অশ্লীলতা, রাহাজানি, প্রতারণা, ছলনা, লোভ, হিংসা-বিদ্বেষ মানুষ তার নিজের তৈরি মায়া জালে আটকা পড়ে আজ ক্লান্ত। সারাদিন ছুটে রিজিকের পিছনে আর রাতে এসে ক্লান্ত পশুর মত ঘুমায়। হায় কত হতভাগা সে অন্তর যে অন্তর আল্লাহর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত।

তুমি তাকিয়ে দেখো তোমার মত কত যুবক আজ নষ্টা নারীদের মন পেতে ব্যস্ত যাতে সতীত্ব বলতে কিছু নাই, পবিত্রতার সাথে যাদের কোন সম্পর্ক পর্যন্ত নাই। যারা নিজেদের সৌন্দর্য কে উচ্চ দরে বিক্রি করতে শিখেছে। কিন্তু ৪০ পার হলেই সে সৌন্দর্য আর কোন দামেই বিক্রি হয় না। তুমি দেখো তোমার মতো কত যুবক আজ ছুটছে চাকরি, ব্যবসা আর ক্যারিয়ার নামক মায়া পিছনে। তুমি জানো তাদের মধ্যে কতজন সফল হয় আর কতজন ঝরে যায়? তবুও তুমি তাদেরকে ছুটতেই দেখবে বিরামহীনভাবে।

আর এ সবকিছু ছাপিয়ে তুমি দেখবে খুব সামান্য মানুষকে- যারা যেন এই দুনিয়ারই না। তাদের পোষাক পরিচ্ছেদ খুবই সাদামাটা, তাদের চলাফেরা খুবই সাধারন। তুমি দেখবে দুনিয়া তাদের মনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তারা দুনিয়ার কাছে বিক্রি হয়নি আর দুনিয়াও তাদের সাথে কোন সওদা করতে পারেনি। কারণ তারা সওদা করছে সরাসরি সারা জাহানসমূহের মালিক আল্লাহ রাব্বুল ইযযাতের সাথে!

সৌন্দর্যকে উচু দরে বিক্রি করে নারীদের পিছনে ঘুরে বেড়াতে পারলে অনেক যুবক নিজেকে ধন্য মনে করে। এই হাতে গোনা বান্দারাও কিন্তু নিজেদের জন্য রমণী খুজে নিয়েছে। আর তারা এমন সস্তা কাউকে বেছে নেয় নি বরং তারা তো বেছে নিয়েছে জান্নাতী নারীদের মধ্য থেকে। যাদের রুপের বর্ননা তোমার অন্তর ধারণা করতে পারবেনা, যাদের একটা রুমাল দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ অপেক্ষা দামি, যারা দুনিয়ায় একবার উকি দিলে সমস্ত পুরুষ পাগল হয়ে যাবে, যাদের সৌন্দর্যের ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন! আর তারা এমন একটা নয়, দুটো নয়, দশটা নয় বরং জনকে বেছে নিয়েছে নিজেদের জন্য ৭২ জনকে বেছে নিয়েছে নিজেদের জন্য। হুর আল আইন, যাদের দেখামাত্র বুকের স্পন্দন থেমে যাবার উপক্রম হয়!

তারা বেছে নিয়েছে মৃত্যুন কষ্ট বনাম সামান্য পিঁপড়ার কামড়ের মতো কষ্ট, তারা বেছে নিয়েছে হাশরের দিনের পঞ্চাশ হাজার বছর অপেক্ষা করা বনাম আল্লাহর আরশে নিচে সবুজ পাখি হয়ে ঝুলে থাকা, তারা বেছে নিয়েছে আল্লাহর সামনে হিসাব দেয়া বনাম বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাওয়া। তারা জানে, তাদের এই জীবন তো আল্লাহরই দেয়া। আল্লাহর হুকুমেই আবার এই জীবন চলে যাবে। শেষ হয়ে যাবে। মাটির সাথে মিশে যাবে। এর বিনিময়ে তারা এটা বেছে নিয়েছে যে, তাদের এই জীবন আল্লাহর জন্য কুরবান হবে এবং তাদের শরীর গলে যাবে না, পচে যাবে না, তাদের রক্ত থেকে মেশক এর ন্যায় সুঘ্রাণ বের হতে থাকবে আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হতে থাকবে।

আল্লাহ এ ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন - আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তোমরা তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (বাকারাঃ ২৫৩)

আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তা নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। (আল-ইমরানঃ ১৬৯)

এরাই হলো তারা যারা মরে যায়, কিন্তু মরে গিয়ে জীবিত হয়ে যায়! এরাই হল তারা যারা আল্লাহর আরশের নিচে সবুজ পাখি হয়ে ঝুলে থাকে। এরাই হলো তারা যাদের মৃত্যু কষ্ট পিঁপড়া কামড় দেয়ার মত। এরাই হলো তারা যাদের প্রথম ফোটা রক্ত মাটিতে পড়ার আগে সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়। এরাই হল তারা যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্ত হয়। এরাই হল তারা যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। এরাই হলো তারা যাদের ৭২ টি হুর আল আইন থাকবে, এরাই হল তারা যারা নিজেদের পরিবার এর ৭০ জন কে নিজের সাথে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে।

এরাই হল তারা যারা - আল্লাহর সাথে প্রেম করতে শিখেছে আর আল্লাহর ভালবাসায় পাগল হয়ে নিজেকে কুরবান করতে শিখেছে!

আমি তো জিহাদ করতেই চাই কিন্তু কিভাবে? কার সাথে? কোথায়?

উস্তাদ আহমাদ যাকারিয়া হাফিজাহুল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন –

তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না। [সুরা বাকারা ২:২১৬]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আরো বলেন -

যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতেই তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুমিনদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত করবেন। [সুরা তাওবা ৯:১৪]

জিহাদের ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন প্রায়ই সামনে আসে, যেমনঃ

কোথায় জিহাদ করব?

কিভাবে জিহাদ করব?

কার সাথে জিহাদ করব?

কারা হক্ক দল?

আমি কিভাবে জিহাদ করতে পারি?

এখন কি জিহাদ করা সম্ভব? ইত্যাদি।

প্রশ্নের উত্তরে যাবার আগে কিছু জরুরী আলোচনা সেরে নেয়া দরকার। সবার আগে আমাদের বর্তমানে জিহাদের কনসেপ্ট ভালো ভাবে বুঝতে হবে। আমরা সাধারণ ভাবে জিহাদ বলতে বুঝে থাকি "কিতাল"। যেটাকে "আর্মড কমব্যাট" ও বলা

যেতে পারে। সশস্ত্র যুদ্ধ। এটা জিহাদের একটা কাজ অবশ্যই কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ জিহাদ না। তাই বিষয়গুলো আমাদের আগে ভালো ভাবে জেনে নেয়া দরকার।

১। গ্লোবাল জিহাদ মডেলঃ

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে জিহাদ চলমান তা হচ্ছে জিহাদের গ্লোবাল মডেল। অর্থাৎ সারা দুনিয়াব্যাপী জিহাদ একই মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হচ্ছে। এই বিষয়টি জানা দরকার এজন্য যে, আমাদের জিহাদি যে কোন কাজ গ্লোবাল জিহাদের বাইরে নয়। অর্থাৎ আপনি একা করেন বা কোন দলের সাথে করেন, আপনার জিহাদি কাজ এমন হওয়া দরকার, তা যেন গ্লোবাল জিহাদের কাজের সহায়ক হয়। এই জিহাদের কাজ যদিও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু দিন শেষে প্রতিটি কাজ একই মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য। যেমন একটি মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বব্যাপী কুফরের সর্দার আমেরিকার স্বার্থে আঘাত করা। এটি একটি মৌলিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। এখন আলাদা আলাদা ভূখণ্ডের জন্য এই উদ্দেশ্য অর্জনের পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। এটি জরুরী নয় যে, প্রতিটি ফ্রন্টে একই কৌশলে কাজ করতে হবে। এছাড়া গ্লোবাল জিহাদ মডেলের জন্য এটিও জরুরী নয় যে, আপনাকে কোন দল বা জামাতের সাথে যুক্ত হতেই হবে। যদি আপনি কোন হকপন্থি জিহাদি জামাত বা দলের সাথে যুক্ত হতে পারেন তবে তা সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু আপনি যদি কোন হকপন্থি জিহাদি জামাতের সাথে যুক্ত হতে নাও পারেন তবুও আপনার জন্য জিহাদের কাজ বন্ধ নয় বরং আপনি নিজে 'একাকী মুজাহিদ' (ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় Lone Wolf) বা কয়েকজন সমমনা দ্বীনী ভাইকে সাথে নিয়ে 'উলফ প্যাক' হিসেবে কাজ করতে পারেন।

২। ইম্প্রোভাইজড আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারঃ

এটাও আমাদের জানা জরুরী যে, আমাদের বর্তমান জিহাদের ধরণ কেমন? এই জিহাদ কোথাও কনভেনশনাল (প্রথাগত যুদ্ধ), আবার কোথাও গেরিলা ওয়ারফেয়ার। তবে অধিকাংশ জায়গায় এই যুদ্ধ 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার'। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা 'আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার'। তাই আমাদের এটাও জানা জরুরী যে, গেরিলা ওয়ারফেয়ার কেমন হয়, বিশেষ করে 'আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার'। এ ব্যাপারে আরো জানার জন্য - এই বইটি দেখতে পারেন, 'Mini Manual of the Urban Guerrilla' By Carlos Marighella' একজন গেরিলা যোদ্ধার কিছু মৌলিক চাহিদা আছে। আর সেগুলোকে এক কথায় প্রকাশ করার জন্য বলতে হয় - একজন গেরিলা যোদ্ধাকে প্রায় সকল বিষয়ে পারদর্শী হতে হয়। বর্তমানের জিহাদ আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারের ইম্প্রোভাইজড ভার্শন। অর্থাৎ এটি আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ার, কিন্তু প্রতিনিয়ত এটি শত্রুর চালের সাথে সাথে এর কৌশল এবং প্রায়োরিটি ইম্প্রোভাইজড করে চলেছে।

৩। ফ্রন্টের ধরণঃ

ভূমির ধরণ। যে কোন যুদ্ধের জন্য 'ভূমির ধরণ' বা সে এলাকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরী। কনভেনশনাল ওয়ারফেয়ারে ভূমির ধরণ বা Terrain বলতে সাধারণত ভূমির ভৌগলিক অবস্থার বিবরণ বুঝায়। কিন্তু গেরিলা ওয়ারফেয়ারে বা আরবান গেরিলা ওয়ারফেয়ারে এটি আরো বেশি কিছু বুঝায়। বর্তমান দুনিয়াতে ভূমির ধরণ অনুযায়ী জিহাদের ময়দানগুলোকে (ফ্রন্টগুলোকে)কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, কিছু ফ্রন্ট আছে যেগুলো সরাসরি কিতাল বা আর্মড কমব্যাট এর জন্য উপযুক্ত। কিছু আছে যেগুলো সরাসরি আর্মড কমব্যাট বা কিতালের জন্য উপযুক্ত না, কোন ভাবেই না। বরং সে এলাকাগুলো সাপোর্টিং ল্যান্ড হিসেবেই বেশি উপযুক্ত। অর্থাৎ ঐ সমস্ত এলাকাগুলো "আর্মড কমব্যাটের" জন্য উপযোগী না। বরং অন্য কোন ফ্রন্টের জন্য সাপোর্টিং ল্যান্ড হিসেবে কাজ করার জন্য বেশি উপযুক্ত। কোন ল্যান্ড কি কাজের জন্য উপযুক্ত তা কিছু বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। যেমন,

- ভূমিরঅবস্থা, (পাহাড়ী, সমতল, মরুভূমি),

- জনগনের অবস্থা (জিহাদের পক্ষে, জিহাদের বিপক্ষে),

- শাসকের ক্ষমতার অবস্থা (ক্ষমতার প্রয়োগ বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে কেমন?)

এবং এরকম আরো কিছু বিষয়ের উপরে নির্ভর করে কোন একটি ফ্রন্টের কাজের ধরণ কেমন হবে। এ বিষয়ে আরো বিশদ ভাবে জানার জন্য - **"Management Of Savagery - By Abu Bakr Nazi"** - এই বইটি পড়ে নিতে পারেন।

৪। শত্রু সম্পর্কে জানাঃ

"If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle."

"তুমি যদি তোমার শত্রুর সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে জানো তবে ১০০ যুদ্ধ হলেও তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। তুমি যদি শুধু নিজেকে জানো কিন্তু শত্রুর ব্যাপারে না জেনে থাকো তবে প্রত্যেক বিজয়ের সাথে তুমি পরাজয়ও পাবে। তুমি যদি শত্রু এবং নিজের উভয় ব্যাপারেই না জেনে থাকো তবে তুমি প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাজয়ের স্বাদ পাবে"।

— সান জু, দা আর্ট অফ দা ওয়ার

এখানে মূল যে বিষয়টি জানা দরকার তা হচ্ছে শত্রু কিভাবে দুনিয়াব্যাপী জিহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে। সত্যি বলতে এটি অনেক বিশদ আলোচনা। এই বিষয়টিকে ভাসমান বরফ খন্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ বরফের উপরে যা দেখা যায় পানির নিচে তারচেয়েও অধিক বিদ্যমান, যা দেখা যায়না। ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার শক্তির যে ক্রুসেড দৃশ্যমান এরচেয়ে হাজার গুন বেশি চক্রান্ত অধিকাংশের সামনে অদৃশ্য। কাফেরদের এই ক্রুসেড শুধু "ট্যাঙ্ক" আর "এফ ১৫" এর নয়। বরং তাদের এই যুদ্ধের আরো বড় একটি ক্ষেত্র হচ্ছে "ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড"। অর্থাৎ আমাদের বিশ্বাস এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কে পরিবর্তন করে দেয়া। এবং এটিই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধ। কারণ - আপনি ট্যাঙ্ক দেখতে পাবেন, কিন্তু তাদের এই চক্রান্ত আপনার চোখে সাধারণভাবে ধরা পড়বেনা। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে - মুজাহিদদের শক্তির একটা বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায় শুধুমাত্র এই সন্দেহ দূর করতে যে - "এখন কোন জিহাদ নাই"! সারা দুনিয়াব্যাপী এখন জিহাদের আরেক রুপ হচ্ছে "মিডিয়া জিহাদ"। বাস্তবতা হচ্ছে - মিডিয়া এখন জিহাদের ৮০ ভাগ কিংবা আরো বেশি। আর এটির কারণ হচ্ছে - শত্রুর আক্রমণের বড় একটা অংশ হচ্ছে মিডিয়া কেন্দ্রিক। শত্রুদের যুদ্ধের অন্যতম একটি কৌশল হচ্ছে - "সাইকোলজিক্যাল ওয়ার"। আপনি যদি মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন বর্তমান সমাজে এই জিহাদ বিমুখীতা এবং জিহাদের ব্যাপারে অপব্যাখ্যার মূল কারণ হচ্ছে - এই "সাইকোলজিক্যাল ওয়ার" বা "প্রোপাগান্ডা"। প্রত্যেকটি যুদ্ধের জন্য একটি আদর্শ দরকার হয়। যে আদর্শের জন্য যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফেররা পরিষ্কার ভাবে জেনে গেছে যে, মুসলিমদের ঈমান এবং আকিদাহ কে বোমা এবং গুলি দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই তারা বেছে নিয়েছে ব্যাটল অফ হার্টস অ্যান্ড মাইন্ড। এখন তারা আকিদাহ কে শেষ করতে চায়না তারা চায় আকিদাহ কে পরিবর্তন করে ফেলতে। আল্লাহ বলেছেন - (ভাবার্থে) কাফেরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা, তারা কক্ষনো তোমাদের বন্ধু নয়। অথচ মুসলিম এখন কাফেরদেরকেই বেশি আপন মনে করে! অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আমাদের উপরে কোন হামলা হলে, আমরা মনে করি, আমাদের কাফের বন্ধুরাই আমাদের নিরাপত্তা দিবে! নাউজুবিল্লাহ!

আপনি জিহাদ করতে চাইলে উপরের ৪ টি বিষয় খুব ভালো ভাবে জানা থাকতে হবে। কারণ এই ৪ টি বিষয়ের উপরে নির্ভর করবে আপনার পরবর্তী কাজের ধরণ কেমন হবে। যেমন আপনি যদি "গ্লোবাল জিহাদ মডেল" ভালোভাবে বুঝতে পারেন তাহলে - কোথায় জিহাদ করব? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই বের করে নিতে পারবেন। আপনি যদি "শত্রু সম্পর্কে জানা" বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নিতে পারেন তাহলে - কিভাবে জিহাদ করব? এই প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই বের করে নিতে পারবেন। আমি জিহাদ করতে চাই কিন্তু তা কিভাবে?

১। নিয়তঃ

সর্বপ্রথম আপনি নিজের নিয়ত ঠিক করবেন। ঠিক কেন এবং কি কারণে আপনি জিহাদ করতে চান? কারণ প্রত্যেক কাজ তার নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। আপনি বিশ্বাস করেন কিংবা না করেন আপনার জিহাদের কাজের জন্য কোন জিহাদি দল, কমান্ডার বা কোন শায়েখ কোন উপকারেই আসবেন না যতক্ষণ না আপনার নিয়ত ঠিক হবে, কারণ - এই পথে চলার জন্য আপনার আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য দরকার হবে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতিত কোন মুজাহিদের পক্ষে সফলতার দিকে এক কদম ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়! তাই সবার আগে আপনি আপনার নিজের নিয়ত ঠিক করে নেন।

২। ইলমঃ

এরপরেই সবার আগে যা দরকার তা হচ্ছে - ইলম। আপনি যা কিছুই করেন না কেন তার আগে আপনার সে বিষয় ইলম দরকার। আপনি যদি সত্যি জিহাদ করতে চান তবে জিহাদের ব্যাপারে ইলম অর্জন করেন। অন্তত এটি সবার আগে আপনার জানা দরকার - আপনি কেন জিহাদ করবেন। জিহাদের এই পথ সোজা নয় এবং সংক্ষিপ্তও নয়, এই লম্বা কঠিন সফরের জন্য আপনার দরকার হবে ইলম। আপনি যথাসম্ভব জিহাদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করার চেস্টা করেন। এবং অবশ্যই তা কুরআন এবং হাদিস দিয়ে শুরু করেন। ইলম শুধু অর্জনের জন্য নয় বরং যা কিছু শেখার তাউফিক আল্লাহ দিবেন তা আমল শুরু করেন। আমল ব্যতিত ইলম কোন উপকারে আসতে পারেনা।

৩। আনসার কিংবা মুজাহিদঃ

জিহাদের জন্য দুটি আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে আনসার এবং মুহাজির। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করেন - আপনি কি একজন মুহাজির হতে পারবেন? নাকি একজন আনসার। আনসার অর্থ আপনি কোন একজন মুহাজির বা মুজাহিদ ভাই এর আনসার হবেন। আপনি আপনার অর্থ সম্পদ, বাড়ি গাড়ি যা কিছু আছে তা দিয়ে জিহাদের আনসার হবেন। অথবা আপনি হিজরত করবেন কিংবা একজন মুজাহিদ হবেন। সবাই মুহাজির হতে পারবে এমন কথা নাই, আবার সবাই আনসার হবে এমন না। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করে দেখেন আপনি কোন কাজ উত্তম ভাবে করতে পারবেন? যেটি আপনার জন্য উত্তম মনে হচ্ছে আপনি সেটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। যদি আপনি মনে করেন আপনি হিজরত করে মুহাজির হতে পারবেন তবে আপনি হিজরতের প্রস্তুতি নেন। আর যদি আপনি মনে করেন আপনি আনসার হতে পারবেন তবে আপনি নিজেকে একজন মুহাজির বা একজন মুজাহিদকে পালন করার প্রস্তুতি হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করেন।

মুহাজির হিসেবে প্রস্তুতির মানে কি? অর্থাৎ আপনি নিয়ত করেন আপনি হিজরত করবেন, এবং এর জন্য যা যা করা দরকার তার সব প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। অনেকে প্রশ্ন করেন - কিভাবে হিজরত করবো? প্রশ্ন হিসেবে এটি অসঙ্গত নয় তবে আমি এবং আপনি যে ময়দানে আছি সে ময়দানের প্রেক্ষিতে এ প্রশ্নটি একটু জটিল। আপনাকে একটি বিষয় বুঝতে হবে - জিহাদ সোজা না। এটা জিহাদ, এখানে কষ্ট আছে, চ্যালেঞ্জ আছে। এই পথে অনেকটাই আপনাকে নিজে নিজে হাটতে হবে। এতে আপনার মন খারাপ করার বা কষ্ট পাবার কিছু নাই। কেন? কারণ আপনিই প্রথম না, বরং আপনার মতই সবাই এরকম ভাবেই শুরু করে। আপনাকে শুরু করতে হবে, এবং বাকি ব্যবস্থা আল্লাহ আস্তে আস্তে করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় বিষয় - মানুষ বিদেশে স্কলারশিপের জন্য কত কিছু করে। বাইরের একটা চাকরির জন্য কত আবেদন করে। তাহলে জিহাদ কেন এর ব্যতিক্রম হবে! আপনি যদি হিজরত করতে চান এই পথ আল্লাহ করে দিবেন ইনশা আল্লাহ কিন্তু শুরুটা আপনাকেই করতে হবে। আমি হিজরত করতে চাই - বলে এই আশায় বসে থাকা চলবেনা যে কেউ একজন এসে আপনাকে হিজরতের রাস্তা দেখিয়ে দিবে। বরং আপনি নিয়ত নিয়ে শুরু করেন দেখবেন আল্লাহ আপনার জন্য রাস্তা সহজ করে দিয়েছেন। এমনটাই বরাবর হয়ে থাকে।

আনসার হিসেবে প্রস্তুতির মানে কি? অর্থাৎ আপনি এখন মুহাজির বা মুজাহিদকে নিজের সমস্ত কিছু অপেক্ষা অধিক ভালোবাসবেন। আপনি আপনার সমস্ত কিছু দিয়ে সেই মুহাজির বা মুজাহিদ ভাই এর সমস্ত প্রয়োজন বিশেষ ভাবে সমস্ত জিহাদি প্রয়োজন পূরণ করার সাধ্যমত চেস্টা করবেন। হতে পারে আপনি সেই ভাইকে আপনার বাসায় রাখবেন, কিংবা আপনার মেয়ের সাথে বিয়ে দিবেন কিংবা যে কোন প্রয়োজনে আপনি সেই ভাইয়ের জন্য এগিয়ে যাবেন, যে কোন বিপদে আপনি ভাইয়ের সামনে ঢাল হয়ে দাড়াবেন, এতে যদি আপনার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিতে হয় তবুও! এটিই হচ্ছে আনসারের কাজ। এখন আপনি নিজে ঠিক করে নিবেন আপনি কতটুকু পারবেন? কিভাবে পারবেন? হতে পারে আপনি আপনার

বাসায় কোন মুজাহিদ ভাইকে রাখতে পারবেন না, কিন্তু আপনি মাসে ২০,০০০ টাকা সাদাকাহ করতে পারবেন, সেটাই করেন।

৪। দাওয়াহঃ

ইলম অর্জনের পরে আপনি যখন ঠিক করে নিলেন আপনি আনসার হবেন নাকি মুহাজির বা মুজাহিদ হবেন তখন অন্য প্রস্তুতির সাথে সাথে আপনি এবার দাওয়াতের কাজ শুরু করতে পারেন। এই দাওয়াতের বিষয়টি আসলে একটু ব্যাপক। আপনার মূল লক্ষ্য থাকবে চেতনা এবং আদর্শ হিসেবে জিহাদের দাওয়াত দেয়া। কেননা কাফেরদের একটি চেষ্টা হচ্ছে চেতনা এবং আদর্শ হিসেবে জিহাদকে বিকৃত করে দেয়া। তাই আপনার কাজ হবে কাফেরদের সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়া। একই সাথে আপনি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তাওহিদের দাওয়াতও দিবেন। এভাবে আপনি আস্তে আস্তে ছোট ছোট তয়িফা বা গ্রুপ গঠনের চেষ্টা করবেন। আপনি তাদেরকে গড়ে তুলবেন এবং তাদের থেকে বিভিন্ন কাজ নিতে পারেন। তাদেরকে আনসার কিংবা মুজাহিদ বা মুহাজির হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এছাড়া আপনি তাদেরকে বিভিন্ন জিহাদি কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেন, যেমন হ্যাকিং, মিডিয়া ইত্যাদি। এই কাজটি আসলে অত্যন্ত ব্যাপক যদি আপনি তা এভাবে গ্রহণ করতে সাহসী এবং ইচ্ছুক থাকেন। এখানে বিষয়টি এমন যে, আপনি নিজে একজন মুজাহিদ হিসেবে গড়ে উঠবেন এবং একই সাথে আরো অনেককে আপনার মত মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলবেন। প্রথম দিকে আপনি কি অর্জন করলেন তা দেখতে যাবেন না, বরং আপনি শুধু এই চেষ্টা করবেন - যত বেশি সম্ভব জিহাদের চেতনা এবং আদর্শকে প্রচার করা। জিহাদের আদর্শ মানে উগ্রতা নয়। এমনকি জিহাদ বুঝেন এমন অনেকে জিহাদের দাওয়াতকে উগ্রতা ভাবেন, এক্সট্রিমিজম ভাবেন যদিও তারা মোটিভেটেড। কিন্তু আসলে আমি যা বলতে চাচ্ছি তা সেরকম কিছু না। আমি যখন বলছি জিহাদ একটি চেতনা - তখন এটির উপস্থাপনা এমন সাবলীল এবং বাস্তবমুখী হতে হবে যেন মানুষ বুঝতে পারে জিহাদ আলাদা কোন বিষয় নয়, বরং নিজের ঈমান এবং আকিদাহ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই জিহাদ অপরিহার্য। আর এই কাজ আপনি সবার আগে আপনার নিজের পরিবার থেকে শুরু করতে পারেন। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে, আপনি হিজরতের ব্যাপারে বদ্ধপরিকর এবং সে অনুযায়ী আপনি চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন অবস্থায় দাওয়াতি কাজ করলে আপনার হিজরতের কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তবে আপনি ইস্তেখারা সাপেক্ষে দাওয়াতের কাজ বন্ধ রাখতে পারেন।

৫। জিহাদে অংশ গ্রহনের ৪৪ উপায়ঃ

জিহাদের অংশগ্রহণের প্রায় ৪০ এর অধিক উপায় আছে। শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি রহঃ এর বিখ্যাত লেকচার আছে - "44 Ways of supporting Jihad" এই লেকচারটি শুনে নিতে পারেন বা এই ম্যানুয়ালটি পড়ে নিতে পারেন। এরপরে আপনার নিজের জন্য যে কাজটি সবচেয়ে সহজ হয় সেটি দিয়ে শুরু করেন। এরপরে আস্তে আস্তে আর বেশি উপায়ে অংশগ্রহণের চেষ্টা করতে থাকেন। আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন ইনশা আল্লাহ। এছাড়া জিহাদ যখন ফরজ তখন জিহাদের প্রস্তুতিও ফরজ। এখন আমার কিংবা আপনার এই বলে বসে থাকার কোন সুযোগ নাই যে, আমি তো জানিনা কিভাবে জিহাদ করব? আমি তো জানিনা কার সাথে জিহাদ করব? কিছু করতে না পারলেও অন্তত প্রস্তুতি নিতে হবে - আনসার হিসবে কিংবা মুজাহিদ বা মুহাজির হিসেবে।

আবারো বলছি জিহাদের ফরজিয়াত পূরণের জন্য কোন দল বা জামাতের সাথে অংশগ্রহণ জরুরী না। হক্বপন্থী দল বা জামাতের খোঁজে থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে দুয়া করতে হবে কিন্তু এই অপেক্ষায় বসে থাকা যাবেনা। এখানে একটি বাস্তবতা আমাদের বোঝা দরকার - আমি কোন দলের সাথে যোগ দিব? এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর আপেক্ষিক। একই সাথে যুদ্ধের ধরণ অনুযায়ী ময়দানে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর আশা করা ঠিক না। মনে করেন, আপনি একটি গেরিলা ইউনিটের কমান্ডার। আপনাকে কেউ একজন ফেসবুকে নক দিয়ে বললো আমি আপনাদের ইউনিটে যোগ দিতে চাই, কিভাবে জয়েন করবো? বা কোথায় জয়েন করবো? আপনি এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? নিরাপত্তার কারণে আপনার পক্ষে এই প্রশ্নের

উত্তর দেয়া সম্ভব না। বাস্তবতাও তাই। আপনি যদি আশা করেন কেউ একজন আপনাকে বলে দিবে কিভাবে কি করতে হবে, কোথায় জয়েন করতে হবে তাহলে আপনি ভুল করছেন। তাহলে আপনি হয়ত নিজেকে জানেন কিন্তু আপনার শত্রুকে জানেন না। এক্ষেত্রে আপনার কোন একটি সফলতা আসলেও তার সাথে একটি ব্যর্থতাও থাকবে।

সব শেষে - আমি জিহাদ করতে চাই এটি বলা সবচেয়ে সোজা। এটি বলে সে অনুযায়ী আমল করা কঠিন, সে অনুযায়ী আমল করে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ধরে রাখা সবচেয়ে কঠিন, যতক্ষণ না আল্লাহ সহজ করে দেন। আপনাকে এখুনি সব করে ফেলতে হবে এমন নয়। বরং আপনি নিজেকে প্রস্তুত করেন সময় নিয়ে। আপনি মনে রাখবেন আপনি যদি আল্লাহর সাথে সত্য থাকেন, আল্লাহও আপনার সাথে সত্য থাকবেন। আপনি যদি সত্যি জিহাদী কাফেলার সাথে শরীক হতে চান আপনাকে জামাতের সাথে শরীক করার দায়িত্ব আল্লাহর। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। তবে ভাবার বিষয় হচ্ছে - একবার জামাতের দেখা পাবার পর আপনি সেই পরিস্থিতির জন্য কতটুকু প্রস্তুত! এমন অনেক ভাই আছেন যারা জিহাদের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু যখন জিহাদের কঠিন বাস্তবতা সামনে হাজির হয়েছে তখন তারা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। তারা এই কঠিন পথ পাড়ি দেয়ার সাহসটুকু যোগাড় করতে পারেননি, কিংবা পথিমধ্যে ঝরে গেছেন!

আপনার প্রতি আমার শেষ কথা - আপনি মুজাহিদ হিসেবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে একজন মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তুলেন, আর মুজাহিদদের সাথে মিলিয়ে দেয়ার জিম্মাদারি আল্লাহর উপরে ছেড়ে দেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন -

"আর যদি তারা (সত্যি) বের হবার (জিহাদের পথে) সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো (প্রস্তুতি গ্রহন করত)। কিন্তু তাদের যাত্রা আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ দেয়া হল, বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক"। [সুরা তাওবা ৯:৪৬]

কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে?

এ ব্যাপারে আমি সরাসরি মহান আল্লাহর কিছু বাণী উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

১. সূরা আত তাওবাহ: 29 - তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।

২. সূরা আত তাওবাহ: 123 - হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

৩. সূরা আত তাওবাহ: 36 - নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

৪. সূরা আন নিসা: 76 - যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।

৫. সূরা আত তাওবাহ: 12 - আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে।

৬. সূরা আত-তাহরীম: 9 - হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

৭. সূরা আল হুজরাত: 9 - যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন।

৮. সূরা আল ফাতহ: 16 - গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিনঃ আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দিবেন।

এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

আমাদের দেশে জিহাদের সিস্টেমটা কি হবে?

জিহাদ চারটি পর্বের সমন্বয়ে গঠিতঃ হিজরত, ইদাদ বা প্রস্তুতি, রিবাত, কিতাল" ।

ক - হিজরত: হিজরত মূলত নিজের দ্বীনকে হেফাজত করার জন্য অন্যত্র চলে যাওয়া। সেটার দূরত্ব নির্দিষ্ট নেই। একই দেশের ভিতরে হিজরতের ব্যাপারে ইমাম আনোয়ার আওলাকী (রঃ) তাঁর 'হিজরত' লেকচারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এছাড়া অনেক সময়, একই দেশে থেকেও অনেক মুজাহিদ নিজের বাড়ী-ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সেটাও হিজরত হতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন ।

খ - ইদাদ : ইদাদ পর্বের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন – ততটুকু সময়ই নেয়া দরকার। এর চেয়ে কম সময়ে কাজ করতে গেলে প্রস্তুতি ঠিকমতো না নিয়ে অপারেশন শুরু করে দিলে, যে কোন জিহাদী তানজিমের জন্য তাদের মঞ্জিলে পৌঁছা কষ্টকর হয়ে যাবে। অর্ধেক প্রস্তুতি নিয়ে কিতাল শুরু করে দিলে হয়তো নিম্নশ্রেণীর কিছু মুর্তাদ পুলিশ কিংবা সৈনিককে কতল করা যাবে, কিন্তু জিহাদের মূল মাকসাদ হাসিল করা কষ্টকর হয়ে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো ঐ মুজাহিদীনরা সাফল্য লাভ করবেন, কিন্তু এই অঞ্চলের মুসলিমদের পরিস্থিতির কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা তখন থাকবে না।

গ - রিবাতঃ এটা মূলতঃ উভয় পক্ষ একে অন্যকে ভীত-সন্ত্রস্থ করে রাখার পর্ব। এই পর্বে মুজাহিদীনরা ছোট ছোট অপারেশন শুরু করেন কিন্তু পুরো একটা এলাকা সম্পূর্ণ নিজেদের আয়ত্বে নেয়ার মতো শক্তি তখনো অর্জিত হয় না। এই পর্বে মূলতঃ গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলতে থাকে যতক্ষণ না মুজাহিদীনরা পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন করেন এবং শয়তানের বাহিনী এতটুকু দূর্বল না হয় যে তাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া যায়।

এই পর্বে মুজাহিদীনরা নিজেদের 'ব্যানার' প্রকাশ করেন। তাদের নির্দিষ্ট সংবাদ প্রকাশক (Spokesman) কাজ করা শুরু করেন। এই পর্বে মুজাহিদীনরা মাঝে মাঝে মিডিয়ায় অডিও-ভিডিও বার্তা পাঠান। তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বার বার সাধারণ মুসলমানদের কাছে পরিস্কার করতে থাকেন।

এই পর্বে মুর্তাদ-কাফিরদের ক্ষতি সাধন করে মুজাহিদীনরা তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্থ করে তুলেন। এটা দেখে সাহসী মুসলমান যুবকরা মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দিতে থাকে। আবার মুর্তাদ-কাফির বাহিনীও মুজাহিদীনদের উপর মাঝে মাঝে আক্রমণ চালায়। এটা অনেকটা কিতাল পর্বের জন্য একটা সূচনা পর্বের মতো কাজ করে।

ঘ) কিতালঃ এই পর্বে মুজাহিদীনরা সরাসরি কিছু এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রনে নিয়ে নেন। কাফির-মুরতাদ বাহিনীর সাথে অনেক ক্ষেত্রে সম্মুখ যুদ্ধ হয়। অনেক সময় সনাতনধর্মী সামরিক অভিযান চালাতে হয়।

কিতাল পর্ব এভাবেই চলতে থাকবে। মুজাহিদীনদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই জিহাদ চালিয়ে যাবে যতক্ষন না পুরো দুনিয়ায় আবারো ইসলামী খিলাফত কায়েম হয়, আল-আকসা মুক্ত হয় ও পরিশেষে ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) এসে জিযিয়া কর তুলে দেন। এরই মাঝে আল-মালহামাও সংগঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

যারা সাধারণ নাগরিক, তাদের উপর হামলা করা কিভাবে জায়েজ হবে?

শাইখুল হাদীস আবু ইমরান (হাফিজাহুল্লাহ)

মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কোনো দেশ, গোত্র ও দলের সাধারণ সদস্যরাও যোদ্ধা হিসেবেই পরিগণিত। তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ।

১। কোরআন থেকে দলীল:

এক, আল্লাহ তাআলা বলেন:

অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা করো, তাদেরকে বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকো। (সূরা তাওবাহ-৫)

দুই, আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

অর্থ: তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীন(ধর্ম) অনুসরণ করে না, যতক্ষণ না নত হয়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (সূরা তাওবাহ-২৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বিখ্যাত গ্রন্থ আল-উম্ম কিতাবে বলেন,

“মূল ফরজ হলো, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে অথবা জিজিয়া দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে থাকে।”

২। হাদীস থেকে দলীল:

তাওহীদ একজন মানুষের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা দেয়। আর যে তাওহীদ গ্রহণ বা ঈমান আনে না তাঁর জান-মালেরও কোনো নিরাপত্তা থাকে না। কেননা, শিরক-কুফরী এমনই জঘন্য অপরাধ। এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

অর্থ: আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” সুতরাং যে ব্যাক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এর সাক্ষ্য দিবে তাঁর জান ও মাল-সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের কোনো হক্ ব্যাতীত। আর তাঁর অন্তরের হিসাব আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত। (বুখারী, মুসলিম ১/৫২, হাঃ নং-২১। নাসায়ী-৬/4 হাঃ নং৩০৯০)

অর্থ: সহীহ মুসলিমে বুরাইদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) কোনো বাহিনী বা সারিয়া প্রেরণের প্রাককালে সেনাপতিকে এই উপদেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ করবে, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে তাদেরকে হত্যা করবে..............।

(সহীহ মুসলিম-১৭৩১, ইবনে হিব্বান-১৫২৩)

অর্থ: তিরমিজিতে বর্নিত হয়েছে, রাসূল (সাঃ) তায়েফবাসীদের প্রতি মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) স্থাপন করেছেন। (সাবিলুস সালাম ৪/২৫৩১)

অর্থ: অপর একটি হাদিস বর্নিত হয়েছে সালামাহ বিন আকওয়া (রাঃ) হতে, তিনি বলেন, আমরা আবু বকর (রাঃ) এর সাথে হাওয়াযেন গোত্রের অধিবাসীদের উপর রাত্রী বেলায় আক্রমণ পরিচালনা করি। রাসূল (সাঃ) তাঁকে আমাদের আমীর নিয়োগ করে দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ)

অর্থ: আতিয়াহ আলকুরাজী (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, বনী কুরাইজার যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর সামনে (কুরাইজাহ গোত্রের জনসাধারনকে) উপস্থিত করা হয়েছে। অতঃপর যাদের পশম গজিয়েছে (সাবালক হয়েছে) তাদের হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। আর যাদের পশম গজায় নি তাদের পথ হত্যা থেকে রেহাই দেন। আর আমি ছিলাম তাদের মধ্যে। অতঃপর আমাকে হত্যা থেকে রেহাই দেন।
(আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিজী। ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে হাসান সহীহ বলেছে।) উল্লেখ্য যে, বনী কুরাইজার সাধারণ লোকদের হত্যা করা হয়েছিল এদের সর্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার কারনে। জনসাধারণদের সবাই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্বেও সবালক সবাইকেই যোদ্ধা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে এবং তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

অর্থ: উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাযম (রহঃ) 'আল মহাল্লা' (৭/২৯৯) গ্রন্থে বলেন, আর এটা রাসূল (সাঃ) এর পক্ষ থেকে সাধারণ নির্দেশ। তিনি তাদের মধ্যে কোনো কর্মচারী, ব্যবসায়ী, কৃষক, বৃদ্ধ কাউকে বাকী রাখেন নি।
এছাড়া,
যদি আমরা একথা মেনে নেই যে, আমেরিকা বা অন্যান্য ইয়াহুদী নাসারা ও কাফেররা বিশ্বাসঘাতক আরব শাসকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। তথাপি ও তাদেরকে হত্যা করা জায়েজ।

সীরাতের দিকে লক্ষ্য করুন, আবু বাসীর (রাঃ) এর প্রসিদ্ধ ঘটনা, যার মূল আলোচনা বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।
রাসূল (সাঃ) ও কুরাইশ কাফেরদের মাঝে হুদাইবিয়ার সন্ধি ও চুক্তি ছিল। তা সত্বেও আবু বাসীর (রাঃ) যখন মক্কা থেকে পালিয়ে মদিনায় মুসলমানদের নিকট হিজরত করলেন তখন কাফেররা এসে চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে আবু বাসীরকে যারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তিনি তাদেরকে হত্যা করে পালিয়ে যান। আর পরবর্তীতে আবু বাসীর (রাঃ), আবু জান্দাল ও অন্য যারা পরবর্তীতে উনার সাথে সংযুক্ত হয়েছেন সবাই মিলে কুরাইশদের কাফেলাগুলোতে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করতেন, তাদের মালামাল ছিনিয়ে নিতেন। অথচ রাসূল (সাঃ) তাঁর এই কাজকে নিন্দা করেন নি। আর একথা সর্ববিদিত যে, যদি রাসূল (সাঃ) এর জ্ঞাতস্বারে কোন কাজ সংগঠিত হয়, আর তাতে তিনি নিন্দা না জানান, তাহলে এটা শরীয়তের পরিভাষায় تقرير বা "রাসূল (সাঃ) এর সম্মতি" হিসেবে গণ্য।

রাসুল (সাঃ) এর সাথে চুক্তি থাকাবস্থায় যদি এটা জায়েজ হয়, তাহলে এই সকল বিশ্বাসঘাতক মুরতাদ আরব শাসক গুলোর চুক্তির কি কোনো বৈধতা আছে?! বরং নিঃসন্দেহে আমেরিকানদের হত্যা করা বৈধ।

৩। সাহাবায়ে কেরামদের থেকে দলীল:

অর্থ: ওমর ফারুক (রাঃ) আবু জানদাল (রাঃ) বলেন, এরা মুশরিক, এদের রক্ত কুকুরের রক্ত। (মুসনাদে আহমদ ও বাইহাকী)
৪। মুফাসসিরীনদের থেকে থেকে দলীল:

এক ইমাম তাবারী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর তাফসীরে তাবারীতে সূরা তাওবাহ এর ৫ নং আয়াতঃ

অর্থ: অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকো। (সূরা তাওবাহ-৫)
এর ব্যাখ্যায় বলেন,
অর্থ: যমিনের যেখানেই তাদেরকে পাও হত্যা করো, চাই তা হারাম শরীফে হোক বা হারাম শরীফের বাহিরে হোক। সম্মানিত মাসসমূহে হোক বা অন্য মাসে হোক। এবং তাদেরকে বন্দি করো। তাদেরকে ইসলামের রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ও মক্কা শরীফে প্রবেশে বাধা দাও। এবং তাদেরকে হত্যা কিংবা বন্দি করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি ঘাঁটি বা রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসে থাকো।
দুই ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন,

অর্থ: মুসলিম ব্যক্তি যখন এমন কোন কাফেরের সাথে সাক্ষাত করে যার সাথে কোন চুক্তি নেই, তখন তাকে হত্যা করা জায়েজ। (তাফসীরে কুরতুবী-৫/৩৩৮)
তিন ইবনে কাছির (রহঃ) বলেন:

অর্থ: ইবনে জারীর (রহঃ) এই ব্যাপারে ইজমা বর্ননা করেছেন যে, মুশরিকদেরকে হত্যা করা জায়েজ, যদি তাঁর সাথে 'আমান' বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি না থাকে। যদিও সে বাইতুল হারাম বা বাইতুল মাকদিসে (পূন্যময় স্থানে) গমনরত অবস্থায় থাকে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর-২/৬)
চার ইমাম তাবারী (রহঃ) অন্যত্র বলেনঃ

অর্থ: এব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, কোনো মুশরিক যদি তাঁর গর্দানে, দুই বাহুতে দাড়িতে হারাম শরিফের সমস্ত লতা-পাতা লটকিয়ে রাখে তার যদি 'আমান' বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি না থাকে তাহলে তাকে হত্যা থেকে ঐ কাজটি নিরাপত্তা দিবে না। (তাফসীরে তাবারী-৬/৬১)

৫। ফোকাহায়ে কেরামদের বক্তব্য:
(ক) ইমাম সারাখসী (রহঃ) বলেন,
অর্থ: মুরতাদদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে হত্যা করার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। কেননা, এরা ঐসকল কাফেরের পর্যায়ে, যার কাছে দাওয়াত পৌঁছে গেছে।

(খ) ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,
অর্থ: যেসকল কাফেরদের সন্ধিচুক্তি, আমান বা নির্দিষ্ট নিরাপত্তা চুক্তি নেই, তাঁকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন জিম্মাদারী নেই। চাই সে যেকোন ধর্মেরই হৌক না কেন। (রওজাতুত তালেবীন- ৯/২৫৯)

(গ) ইবনু মুফলিহ (রহঃ) বলেন:
কাফের এর সাথে যদি কোন 'আমান' না থাকে তাহলে তাঁকে হত্যা করলে কোন ধরনের দিয়ত বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা সাধারণভাবে তাঁর রক্ত শুকুরের রক্তের ন্যায় বৈধ। (মিবদা'-৮/২৬৩)
(ঘ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন:
বরকতময় আল্লাহ তাআলা কাফেরের রক্ত ও মাল বৈধ করে দিয়েছেন, তবে যদি সে জিযিয়া প্রদান করে অথবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা চুক্তিতে থাকে তাহলে নয়। (আল-উম্ম ১/২৬৪)

(ঙ) ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন,
"আর কাফেরদের রক্ত মৌলিকভাবেই বৈধ, যেমনটা তরবারির আয়াতে রয়েছে। অধিকিন্তু যখন তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হবে।" (আস-সাইলুল জিরার-৪/৫২২)
তিনি আরো বলেন:
"মুশরিক চাই সে যোদ্ধা হোক বা না হোক যতক্ষণ সে মুশরিক থাকবে ততক্ষণ তাঁর রক্ত বৈধ।" (আস-সাইলুল জিরার-৪/৩৬৯)

(চ) ইমাম মাওয়ারদী (রহঃ) "আহকামুস সুলতানিয়াহ" কিতাবে বলেন,
মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধের উপযোগী যে কাউকে সুযোগ পেলেই হত্যা করা বৈধ। চাই তারা যুদ্ধরত হোক বা না হোক। (আহকামুস সুলতানিয়াহ"/চতুর্থ অধ্যায়) ।

(ছ) বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারীদের জবাবে প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ (রহঃ) (যিনি ইবনে কাছীর ও আল্লামা যাহাবীর শিক্ষক) এর স্পষ্ট বক্তব্য হলোঃ

যুদ্ধরত কাফেরদের যাকেই পাবে তাকেই হত্যা করা মুসলমানদের জন্য বৈধ। চাই সরাসরি সে যোদ্ধা হোক অথবা না হোক। চাই সে যুদ্ধে গমনকারী হোক বা যুদ্ধ থেকে পিছনে থাকুক। দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বানী:

"অতঃপর মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও সেখানেই হত্যা কর, তাদেরকে বন্দী করো, অবরোধ করো এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকো" । (সূরা তাওবাহ-৫)

বাস্তবতা: বাস্তবতা হচ্ছে, আমেরিকা ও ইসরাইল আমাদের সাধারণ মুসলমানদেরকে দিন-রাতে হত্যা করে যাচ্ছে। তারা দখলদার ইসরাইলের মাধ্যমে ৫০ বছরের ও বেশী সময় ধরে ফিলিস্তিনে আমাদের সাধারণ মুসলমানদেরকে হত্যা করে যাচ্ছে। তাদের ঘর বাড়ি বোমা মেরে, বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছে। আর আফগানিস্তান ও ইরাকের কথা কি বলবো! সেখানে তারা হাজার হাজার নিরপরাধ সাধারণ মুসলমানদেরকে হত্যা করেছে। তারা সোমালিয়ায় ১৩ হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছে ও সুদানে গনহত্যা চালিয়েছে। এককথায় সারা বিশ্বে এই আমেরিকা আমাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। মুসলমান, মুজাহিদদেরকে হত্যা, গ্রেফতার ও নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।
তারা যেমন আমাদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে আমরাও তাদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা বৈধ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"সুতরাং যে তোমাদের উপর সীমালঙ্ঘন করে তাদের উপরও তোমরা সীমালঙ্ঘন করো যেমন সীমালঙ্ঘন তারা তোমাদের উপর করেছে" । (সূরা বাকারাহ-১৯৪)
আমেরিকার সাধারণ জনগণ তাদের সরকারকে ট্যাক্স দিচ্ছে। সেই দেশে অবস্থান করে সেই দেশ ও শাসকদের স্বার্থে বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের এই অসম্মতি তাদের নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ না তারা তাদের স্থান ও অবস্থান পরিত্যাগ করে।
একটা বিষয় স্মর্তব্য যে, আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদরা যখন কোনো কাজ করেন তখন এটা শরয়ীভাবে যাচাই বাছাই করেই করে থাকেন।
আর কাফেররা মুজাহিদদের নিন্দা বা বিরোধিতা করা নতুন কোন বিষয় নয়। এমর্মে আল্লাহ তাআলা বলেন,
তাঁরা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং এক্ষেত্রে তাঁরা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। ...। (সূরা মায়েদাহ-৫৪)

সাওবান (রাঃ)বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন: সর্বদা আমার উম্মতের একটি তায়েফাহ (দল) হক্কের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদেরকে যারা নিন্দা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিয়ামত সংগঠিত হওয়া পর্যন্ত তারা এর উপর অটল থাকবে। (সহীহ মুসলিম)
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য।

জিহাদে অংশগ্রহণের ৪৪টি উপায় -

০১ > জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা।
০২ > শাহাদাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।
০৩ > নিজের মাল সম্পদ দারা জিহাদ করা।
০৪ > মুজাহিদদের জন্য টাকা সংগ্রহ করা।
০৫ > একজন মুজাহিদকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা।
০৬ > একজন মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।
০৭ > শহীদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।
০৮ > জেলে বন্দি ভাইদের পরিবারগুলোর দেখাশোনা করা।
০৯ > মুজাহিদদের যাকাত প্রদান করা (জিহাদের খরচ বাবদ)।
১০ > মুজাহিদদের মনোবল বাড়ানো এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করা।
১১ > মুজাহিদদের চিকিৎসায় সাহায্য প্রদান করা।
১২ > মুজাহিদদের সমর্থন করা এবং তাদের জন্য উঠে দাঁড়ানো।
১৩ > পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যাচারের মোকাবিলা করা।
১৪ > মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা।
১৫ > জিহাদের ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহ প্রদান করা।
১৬ > মুজাহিদদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের গোপোনীয়তা রক্ষা করা।
১৭ > মুজাহিদদের জন্য দোয়া করা।
১৮ > জিহাদের খবর জানা এবং তা প্রচার করা।
১৯ > মুজাহিদ এবং তাদের আলেমদের লেখনী প্রচার করা।
২০ > মুজাহিদদের পক্ষে ফতোয়া দেয়া।
২১ > আলেম এবং ইমামদের মুজাহিদদের তথ্য এবং খবর পৌঁছে দেয়া।
২২ > শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করা।
২৩ > অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেয়া।
২৪ > প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেয়া।
২৫ > জিহাদের ফিকহ্ ও মাসলা জানা।
২৬ > মুজাহিদদের রক্ষা করা এবং তাদেরক সাহায্য করা।
২৭ > “আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা” - এই আকিদার বিকাশ করা।
২৮ > মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্য পালন করা।
২৯ > জিহাদি ওয়েবসাইট তৈরী করা।
৩০ > আমাদের সন্তানদের জিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি ভালবাসা শেখানো। ফতোয়া দেয়া।

৩১ > বিলাসী জীবনযাপন এড়িয়ে চলা।

৩২ > মুজাহিদদের কাজে লাগে এমন যোগ্যতা অর্জন করা।

৩৩ > যে সব দল জিহাদের জন্য কাজ করছে তাদের সাথে যোগ দেয়া।

৩৪ > হক আলেমদের দিকে অন্যদের এগিয়ে আনা।

৩৫ > হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকা।

৩৬ > আত্মিক প্রশিক্ষণ নেয়া।

৩৭ > মুজাহিদদের নসিহাহ্ দেয়া।

৩৮ > ফিতনা বিষয়ের হাদিস পড়া।

৩৯ > বর্তমান যুগের ফেরাউন এবং তার জাদুকরদের মুখোশ উন্মোচন করা।

৪০ > নাশীদ (জিহাদি গজল) তৈরী করা।

৪১ > শত্রুদের অর্থনীতি বর্জন করা।

৪২ > আরবী শেখা।

৪৩ > বিভিন্ন ভাষায় জিহাদি লেখনী অনুবাদ করা।

৪৪ > 'ফিরকাতুন নাযিয়ায়' বা “মুক্তি প্রাপ্ত দল” - এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষা দেয়া।

==

পরিশেষে আল্লাহর কাছে দুয়া করি - আল্লাহ আপনার এই কাজে সাফল্য দান করুন, কামিয়াবি দান করুন এবং আমাদের কাজগুলোকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নিন। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের আমলগুলোকে আপনার সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নিন এবং সাহায্যকারী হিসেবে আপনি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আমরা শুধু আপনার উপরেই ভরসা করি এবং আপনার কাছেই আমাদের সবার প্রত্যাবর্তন। আমিন।